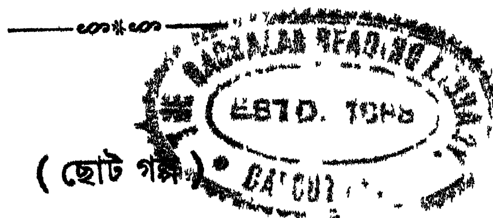
পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহ[illegible] তা[illegible]

মুক্তির দিশা



(ছোট গল্প)

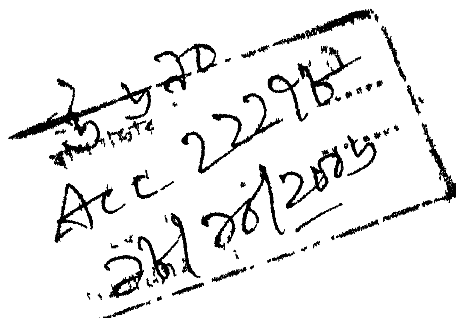
শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ
প্রণীত।

১৩৩০

ডি, এম লাইব্রেরী
৬৪-২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

মূল্য

শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্ত্তৃক
ডি. এম্ লাইব্রেরী
৬৪।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত



প্রিণ্টার—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় বি, এ
শ্রীসরস্বতী প্রেস।
২৬-১ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

মুক্তির দিশা

আমার সোদব প্রতিম স্নেহের

মণিকে

দিলাম।

উপহার-পৃষ্ঠা

কে

আমার নিদর্শন স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি উপহার

দিলাম।

শ্রী

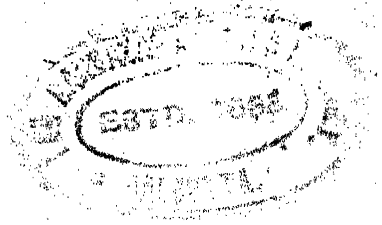
শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন	শুদ্ধ
এক ছত্র	৪	১০	একছত্র
প্রয়োজন অধিক	৭	৮	প্রয়োজনের অধিক
বাড়িতে	৩১	১৬	বাড়িতে
প্রেমে কত প্রেম	৭২	পত্রশীর্ষ	সঙ্গমতীর্থ
” ” ”	৭৪	”	”
” ” ”	৭৬	”	”
” ” ”	৭৮	”	”
” ” ”	৮০	”	”
আমার আপন যে তোমার হয় তারা	৯১	৯	আমার আপন হয় তারা যে
মায়ের	৯১	১০	তোমার মায়ের
অধীনস্থ	১০৬	৭	অধীতস্থ
সবারাই	১০৭	১৭	সবারই
বণছো	১১০	৭	বনছো
রগরাচ্ছি	১১৫	৩	রগড়াচ্ছি
রূপ গলির	১২০	২	রূপ ঢেকে গলির
ামলাতে	১২৩	৮	সামলাতে

গ্রন্থকারের নিবেদন।

"প্রেমে কত প্রেম" আমার আগেকার "নারায়ণের" যুগের লেখা। তারপর আমার জীবনের গতির সঙ্গে জগত দেখার ভঙ্গীও বদলে গেছে; বাকি কয়টি গল্প সুতরাং নতুন পথের পথিকের কথা। এ পথের শেষে কি আছে আমি নিজেই জানিনে।

সূচীপত্র।



মুক্তির দিশা।

——::*::——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পটলার কথা।

তার পিতৃদত্ত নাম ছিল দুর্গাগতি, ছেলে বেলায় ডাকনাম ছিল পটলা। লেখা পড়া শিখে, নভেল পড়ে, কবিতা লিখে, রোমাণ্টিক ফ্রেণ্ডশিপ করে, তাদের ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ ক্লাবে লেকচার দিয়ে পটলা যখন মানুষ হ'লো, তখন তার বয়স চব্বিশ। "এ যৌবন-জল তরঙ্গ রোধিবে কে ?"—কাজেই অসহায় পটলা সে স্রোতে একদম কুটোগাছির মত ভেসে গেল, অর্থাৎ তার চূর্ণ চিকুর কুন্তলে ওরফে বাবরিতে লতার বল্লরীর মত কুঞ্চন দেখা দিল, গোঁফ ও দাড়ি

বামানোর চোটে একেবারে লোপাট হযে, বক্ত ওষ্ঠ আব গৌর চিবুক বেরুল, তার অঙ্গেও এল লতাব মত আশ্রিতাব ভাব, চলনে জাগলো "সখি আমায ধর ধব" ভঙ্গী, তার চোখেব চাহনি হলো কখন উদাস, কখন বিলোল, কখন "আধ মেলা ভাব-ডুবুডুবু।" সঙ্গে সঙ্গে পটলার ডাক নাম আর বাপ-মাযেব দেওযা ঐ অসভ্য নামটা বদলে গিযে পোষাকী নাম দাঁড়াল জ্যোৎস্নাজীবন সান্ন্যাল।

বলা বাহুল্য যে তাব এই সব ভাবান্তর দেখে নিদ্দয বন্ধুর দল তাব পেছু লাগলো। কেউ নাম দিলে জ্যোৎস্নাচিকোন, কেউ নাম দিলে বৌমা, কেউ তাব সেই অশ্রাব্য ডাক-নামটাবই একটা স্ত্রী-সংস্কবণ কবে নিযে, নাম রাখলো শ্রীমতী পটলবালা দেবী। বন্ধু-দেব বড দোষ ছিল না, কারণ পটলা উড়ুনি মাটিতে লুটিযে চলতো, তুলে গাযে দেবার সময উড়ুনি তোলবার ভঙ্গীতে মনে হতো বুঝি কোন সীমন্তিনী তার খসা আঁচলখানা বুকে দিচ্ছে। তার ওপর পটলাব উদারা কণ্ঠস্বর কি করে যেন ক্রমে ক্রমে মুদারা থেকে

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তারায চড়ে সেই পর্দ্দার পঞ্চমে গিয়ে দাঁড়ালো। সে অন্য ঘর থেকে যখন গাইত "যদি বারণ কর তবে গাহিব না," তখন মনে ভ্রম হ'তো, হয়তো কোনো তরুণী বাঈজী বা গলা সাধছে। কাউকে চিঠি লিখতে হ'লে তার দশ পাতার কমে চলতো না আর সেই দীর্ঘ গদ্য-কথিকার অন্ততঃ বার আনা অংশ থাকতো রবিবাবুর গানের ও কবিতার কোটেশন।

সে নিজেও কবিতা লিখতো মন্দ নয়, কিন্তু সে কবিতার ভাব-ভাষা-ঝঙ্কার সবই ছিল রাবীন্দ্রিক। কোন বড় লোককে কোনভাবে চলতে ব'লতে লিখতে দেখলেই, পটলা কেমন যেন স্বভাব বশে তা নিজের কাজ-কর্ম্মে হাবে-ভাবে নকল করতো! এই রকম করে-করে তার নিজের অন্তরের মানুষটি ফোটবার কোন সুবিধা ও সুযোগ না পেয়ে ক্রমে ক্রমে বেঙ্কুড় আকার ধারণ করলো! ফলে পটলা হ'ল মানুষের হাব-ভাবের জোড়াতালি দেওয়া এক বিরাট নকল! তা ছাড়া জগদ্ধিতায় একটা না একটা বড় খেয়াল তার মাথায় সদা সর্ব্বদা বাসা বেঁধে থাকতোই;

মুক্তির দিশা।

কখন দেশোদ্ধার, কখন বিশ্ব-মানবতা, কখন বিধবা-বিবাহ আবার কখন আজীবন কৌমার ব্রত, কখন বুদ্ধের নির্ব্বাণ এবং পরক্ষণেই চণ্ডীদাসের ভক্তিরসের পদাবলী। এইরূপে ক্রমে ক্রমে নানা আদর্শের মুখরোচক পক্কান্ন, বুদ্ধির খোলায় পাক করে করে পটলার ধ্রুব ধারণা হয়েছিল, যে তার এ দুর্লভ জীবনটা মানব-জাতির কল্যাণের জন্যই হয়েছে। যার বাস্তব-জীবনে এক রতি ত্যাগ, তপস্যা বা পর-হিতব্রত ছিল না, সে দিবারাত্র দধীচির নামে কবিতা লিখতো, নয় এক ছত্র গণ-তন্ত্রের সম্বন্ধে প্রবন্ধ ভাঁজতো; অথবা দারিদ্র্য-ব্রতের মহিমা কীর্ত্তন করে বন্ধু-মহলে বক্তৃতা দিত যে তার জীবনে শুধু উপযুক্ত অবসর সুবিধারই যা অভাব, নইলে সে একটা সেণ্ট বার্ণাড বা লিঙ্কল্‌ন্ নিশ্চিতই হতে পারতো। এই রকম ফাঁকা ভাব-বিলাসিতা আর ক্ষুদ্র স্বার্থ-পর জীবনের চাপে পটলার ভিতরটা ক্রমে ক্রমে পচে আসছিল।

এই অবস্থায় তার বাপ কার্ত্তিকচন্দ্র সান্যাল,

একদিন জীবনের জমা-খরচ শেষ করে, ভব-পারে চলে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে পটলাকে গেলেন অকূল সাগরে ভাসিয়ে। কারণ তাঁর অতুল সম্পত্তি দিয়ে গেলেন বিধবা মেয়ে তারামণিকে, যে সম্পত্তির পনের আনা গেল বিপুল ঋণ-ভার চোকাতে। বিষয়ী ধূর্ত্ত, পরিণাম-দর্শী কার্ত্তিকচন্দ্র এতদিন ছেলের সব আব্দার যেমন রক্ষা করে এসেছিলেন, তেমনি বুঝেও ছিলেন যে পটল এ বিষয় হাতে পেলে তাঁর নামে অপযশ আনবে। গরদ-পরা নিরাভরণা ভক্তিমতী মেয়েকে তিনি বিশ্বাস করতেন বেশী, মেয়েও তাঁর এ বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখলো ; পিতার মৃত্যুর পর দেন দারদের ডেকে ডেকে তাদের পাই-পয়সাটি অবধি চুকিয়ে দিয়ে, সামান্য টাকা নিয়ে ভদ্রাসন বাড়ীখানি আগলে বসে রইল তার ভরা জীবনের শূন্য হাট সাজিয়ে, আর কলকেতার মেসে রয়ে গেল পটলা, যার সমস্ত মানব জাতির কল্যাণের এত সাধের স্বপ্ন-সৌধ আজ এক ঝাপ্‌টায় গুটিয়ে নিজের মেস-খরচার দুশ্চিন্তায় এসে দাঁড়াল। তার ওপর যত নির্দ্দয়

ফিঙের পাল আজ ঝড়ো হাওয়ায় চিল-বেচারীকে কাবু দেখে ঠোকরাতে স্বরু করল। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বন্ধুদের কেউ বললো, "ওর ভাবনা কি? Plain living and high thinking ওর অভ্যাস আছে ;" কেউ বললো, "আহা দধীচির অস্থি এবার জগতের কাজে লাগে বুঝি!" কেউ তার পিঠ ঠুকে বললো "ভায়া হে, Son of God hath no place to rest his head 'ওটা মহাপুরুষেরই লক্ষণ।"

যে পটল তার, এসেন্স সাবান, ছড়ি, ঘড়ি ইত্যাদি পুরোদস্তুর বাবুয়ানীর জীবনে মাসে একশ' দেড়শ' টাকা অবধি উড়িয়েছে তার আজ পেটের ভাত জোটান দায়। একমাস সে একটা নতুন মাসিকের সহকারী সম্পাদকী করে ছেড়ে দিল, একজনের লেখা নভেল নিজের বলে ছাপাতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হলো, শেষে দু'মাস বেকার ব'সে ওয়াণ্টেড কলমটা নিত্য আশায়-নিরাশায় পাঠ ও চাকরীর উমেদারীতে কাটাল। ক্রমে যখন মেসের ঋণ উত্তমর্ণের চক্রবৃদ্ধি

হারের সুদের মত নির্ম্মম অঙ্কে বেড়ে চললো, তখন পটলের শেষে মনে পড়লো, তার বিধবা বোন তারামণির কথা।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পটলা-হরণ

বাপ বেঁচে থাকতে পটল কখনও বাড়ী যায় নি, সবাই জানতো কার্ত্তিকচন্দ্র তাঁর একমাত্র পুত্র-সন্তানকে তার প্রয়োজন অধিক অর্থ দেন, কিন্তু তার মুখ দেখেন না। এত-বড় ব্যাপারটার কারণ কিন্তু কেউ জানতো না, জানতো শুধু মুখ বোজা নীরব মেয়ে তারামণি। মেসের ছেলেরা এই নিয়ে পটলাকে অনেক রকমে বেয়ে চেয়ে দেখেছে কিন্তু এ রহস্যের কোন একটা কূলকিনারা

করতে পারে নি। আজ চার মাস পর পিতৃবিয়োগে সত্যি সত্যি চারদিক অন্ধকার দেখে আর পরম বন্ধুদের ঠাট্টা-তামাসায় উদ্বাস্ত হয়ে পটলচন্দ্র বাড়ী এল। তখন ডুবন্ত রবির সিঁদুরে রং পশ্চিম আকাশের পাটে সন্ধ্যা দেবীর সীমন্তটি রাঙিয়ে দিচ্ছে, দিগন্তের কোল থেকে আপন ছায়া-শ্যাম নীলাম্বরী খানি তুলে নিয়ে অঙ্গ ঢাকতে সন্ধ্যা-বধূ সবে জড়িত-চরণে তাঁর শয়ন-মন্দিরে আস্‌ছেন।

কার্ত্তিকচন্দ্রের পাঁচিল-ঘেরা ইটের বাড়ী, সামনে ফুলবাগান, পেছনে খিড়কীর পুকুর। বাড়ীখানি আম, জাম, নিম, অশথ, শিউলী, কদম গাছে গাছে ঢাকা, দূর থেকে ছাতের শেওলা-পড়া আলিশার কোনটুকু মাত্র দেখা যায়। পটল যখন বাড়ী এল, তখন তারামণি সবে স্নান করে সিক্ত-বস্ত্রে তুলসী-তলায় প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করছে, ভাইকে দেখে ইসারায় ঘরে উঠতে বলে তারামণি একমনে মালা জপতে বসে গেল। তার আহ্নিক শেষ হ'তে লাগলো এক ঘণ্টা, ততক্ষণে পটল জলযোগ সেরে হুঁকোটি নিয়ে

দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে। দাসী লক্ষ্মী এগারো বছরের মেয়ে, মা-হারা, অনাথা মেয়ে তারামণির হাতেই মানুষ, সে পটলের ফাইফরমাস শেষ করে সবে হেঁসেল নিকোতে লেগে গেছে।

তারামণি ভূঁয়ে আঁচল পেতে দোর গোড়ায় বসে ভাইকে জিজ্ঞেস কল্লো,—বড় রোগা দেখছি যে?

পটল। এই, অমনি আর কি!

তারা। আজ আমি চার মাস একাটি পড়ে, আগে এলেই পার্‌তিস্!

পটল। তোমার ঘর-দোর, দিদি যদি ঢুক্‌তে না দেও!

তারা। ওমা! ও কি কথা? তুই আমার মার পেটের ভাই নোস্?

পটল। তাহ'লে কি হয়; এতদিন এ-মুখো হবার পথ ছিল?

তারা। সে বাবার জন্যে। তিনি পুরুষ মানুষ, কঠিন-প্রাণ। আমি তো তোর বোন।

পটল আর কিছু বললো না, তার একটা স্বস্তির দীর্ঘ নিশ্বাস পড়লো মাত্র। অনেকক্ষণ ভাই-বোনে সেই সন্ধ্যার ঘোরে নীরবে বসে রইল। হঠাৎ তারামণি একটু কেশে একটু ইতস্ততঃ করে বলে ফেললে,—তার খবর কিছু রাখিস্ ?

পটল চমকে উঠে বললো,—কার ?

তারা। বিন্দুর ?

পটল। না,—আমি কি করে জানবো।

আবার অনেকক্ষণ দু'জনেই নীরব। ঘরে উঠানে কলা-ঝোপে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। আজকের সন্ধ্যা কুহকময়, বড় ছমছমে। ঘরেও আলো নেই। দূরে পশ্চিম আকাশের ওষ্ঠে তখনও উদাস হাসির পাটল আভাসটুকু জেগে রয়েছে। সেও যেন কি মর্ম্মান্তিক রহস্যের স্মৃতিটুকু বুকে ধরে কত কি অর্থ-ভরা উদাস হাসি হাসছে।

তারা অগত্যা বললো,—তোরা পুরুষ মানুষ বড় নির্দ্দয়।

পটল। কেন ?

তারা। কেন আবার? বল্‌তে লজ্জা করে না? হতভাগীকে এমন সর্ব্বনাশের পথে তুলে দিয়ে কিনা তুই পালিয়ে গেলি!

পটল হাতের হুঁকো রেখে দিল, সনিশ্বাসে বললো,—তুমিও দিদি তাই বিশ্বাস কর?

তারা। তবে কি হয়েছিল, আমায় বল।

পটল। হয়েছিল আমার মাথা আর মুণ্ডু। বিন্দু কত বড় দস্যি মেয়ে তা' কি তুমি জানো না? আমি তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারি? আমি তাকে নিয়ে পালিয়েছিলুম, না, সেই-ই আমায় নিয়ে পালিয়েছিল!

তারামণি চুপ করে রইল। দিদির বিশ্বাস হয় নি বুঝে পটল অকূল সাগরে পড়লো, ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হুঁকোটা আবার তুলে নিয়ে বললো,—আমার কপাল, তা' তুমি বিশ্বাস করবে কেন?

তারা। ওরে, আমি তোর মুরোদখানা জানি। সে না সায় দিলে তুই তার কাছে এগুতে পারবি নে,

তা কি আমি বুঝি নে? আমায় সব কথা বল, যেখানে মিথ্যে বলবি আমি ধরে ফেলবো।

পটল। সে কি মেয়ে মানুষ, না রাক্ষুসী! সাধে কি হরিশদা নাম রেখেছিল জেনারেল বিন্দি। তুমি তো সবই জান, ছেলে বেলা থেকে—আমাদের কত ভাব! তার যখন জমিদার-বাড়ী বিয়ে হবে-হবে তখনই সে এমনিতর পালাতে চেয়েছিল, আমি যেতে রাজী হইনি। চির দিন আমিও তাকে ভাল-বেসেছি, কিন্তু কেমন যেন কোন দিকেই হাত-পা এগোয় নি।

তারা। টাকার লোভে তার বাপ-মা যে হনু-মানের হাতে দিলে, তাতে না পালানোই আশ্চর্য্য! হিঁদুর মেয়ের সবই সয়। আমরা তো মেয়ে নই, শাপ-গ্রস্তা পাষাণী অহল্যা, কবে এদেশে শ্রীরাম-চন্দ্রের মত পুরুষ জন্মাবে—তবে তার পরশে আবার এ পাষাণীরা সত্যিকার মেয়ে হবে!

পটল। এই গাঁয়ে আর আশেপাশে জমিদার পুত্তুর যত কাণ্ড করেছে সবই তো বিন্দু ছেলেবেলা

থেকে শুনে এযেচে। বিয়ের রাত্রে আমার কাছে যে বুক-ভাঙা কান্নাটা কেঁদেছিল,—

তারা। তাইতো বলি, পুরুষ মানুষ তোরা বড় পাষাণ—

পটল। কেন? আমার দোষ কি?

তারা। তোব দোষ কি, দোষ বিধাতার। সে তোকে শক্ত ধাতুতে গড়লে, বিন্দুর মত মেয়েটার জীবন শ্মশান হযে যেতে পারে?

পটলা মুখ ভাব করে বসে রইল, তার পর বললো,—যা বলছিলুম, বলি। পাঁচ বছর আগের সেই দুর্য্যোগের রাত্তিব তোমার মনে আছে, আমি আসছিলুম নসিপাড়া থেকে। তখন কালো ঘন চাপ-চাপ মেঘে সারা আকাশ আঁধার, বৃষ্টি হয়-হয়। রাত্রি আটটা। ওদের বাড়ীর খিড়কীর পুকুরের বাঁশ ঝাঁড় থেকে বিন্দু বেরিয়ে এসে আমার হাত ধরলো। আমিতো অবাক্; তার বাঁ হাতে আচলে-ঢাকা একটা পুঁটলীর মত কি। আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি, সে আমায় টেনে নিয়ে যেতে যেতে

বললো,—যদি কাল ঐ পুকুরে আমার মরা দেহ ভাসতে না দেখতে চাও, তা'হলে এখন আমায় কিছু জিজ্ঞেস করো না। যেখানে নিয়ে যাই, চলো। যখন মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এলো তখন আমরা ষ্টেশনের টিনের চালায় পৌঁছে গেছি। সে আমাকে দিয়ে কাশীর দু'খানা টিকিট করালে, টাকা সেই দিলে। গাড়ীতে বসা অবধি আমার মুখ খুলতে দিল না; যতবার কথা বলতে গেছি, ততবার সে এমন করুণ-চোখে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়েছে যে আমার বাক্ আপনি হরে গেছে! গাডী ছাড়বার পর সে বেঞ্চির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো আর ঝাড়া একঘণ্টা ফুলে ফুলে কাঁদলো। তার পর হঠাৎ চোখ মুছে উঠে বসে এলোচুলগুলো হাতে জড়িয়ে বাঁধলো, আর শেষে আমার দিকে শান্ত চোখে চেয়ে বললো "এইবার বল কি বলবে।" তখন দেখি বিন্দী হাসছে। দিদি, তোমরা মেয়েমানুষ এক তাজ্জব জিনিষ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বিন্দুর চিঠি

আমি বললুম,—বিন্দু! আমায আগে বল, এ ব্যাপারটা কি?

বিন্দু। কি আর? আমি পালিয়ে যাচ্ছি।

আমি। পালিযে যাচ্ছ? কোথায়?

বিন্দু। যে দিকে দুই চক্ষু যায়।

আমি। আর আমি? আমাকে টানলে কেন?

বিন্দু আবার আমার দিকে সেই রকম করে চাইল, তার চোখ ছাপিয়ে জল ঝরে পড়লো। তাড়াতাড়ি তা' মুছে ফেলে কঠিন স্বরে বললো, 'আমি একটা আস্তানা ধরলে তুমি তোমার পথে যেয়ো।' এর পর আমার যেন কণ্ঠরোধ হয়ে এল। অনেকক্ষণ দু'জনে চুপ করে গাড়ীর জানালা দিয়ে বাহিরে গাছপালার ছায়াবাজির দিকে চেয়ে ছিলুম। তখন চাঁদ উঠেছে, জগত হাসছে! অনেক ভেবে-চিন্তে আমি

এ কথাটা না জিজ্ঞেস করে পারলুম না,—বিন্দু! আমরা পালাচ্ছি তা' হ'লে এত পথ লুকিয়ে এসে গাড়ী ছাড়বার আগে অমন করে গাঁয়ের কেষ্ট কাকার সামনে ঘোমটাটা তুললে কেন?' বিন্দু প্রথমে কিছু উত্তর দিল না, তারপর বললো, 'ও গিয়ে যা' দেখেছে তা বলবে বলে। আমার ফেরবার পথে কাঁটা দিয়ে যাচ্ছি, বিন্দি আজ থেকে ওদের কাছে যাতে মরার বাড়া হয়ে যায়।'

আমি। তোমার যা' হবার হলো, আমাকেও কলঙ্কে জড়ালে!

বিন্দুর মুখ-চোখ রাঙা হয়ে উঠলো, সে চেঁচিয়ে বললো,—তুমি পুরুষ মানুষ, তোমার কি? ঘরে ফিরে যেয়ো, সমাজ তোমায় মাথায় তুলে নেবে। আর দেবতার কাছেও তো তুমি নিষ্পাপ, একটা মেয়ে মানুষকে দিন দিন জীবন্তে দগ্ধে মারার জীবন থেকে বাঁচাতে, এইটুকু বদনামের ক্ষতি সইতে পারো না?

আমার মুখে যেন কে চড় মারলো। আমি এর পর আর কথাটি কইলাম না।

তারা। তার পর?

—তার পর আর কি? কাশীতে পৌঁছে আমরা একটা ঘর ভাড়া করে কয়েক দিন ছিলাম, তার পর আমি একবার দেশে এলাম, বাবা ব্যাপারটা কি চোখে দেখেছেন জানতে এসে সেই এস্তক এখানেই আছি।

তারা। কাশীতে সে একা থাকে?

পটল। না, গিরীনের বাড়ীতে আছে।

তারা। গিরীন কে?

পটল। একটি ছেলে, সেও কাশীতেই আছে, বেশ পয়সাওয়ালা। জীবনে যেন কি দাগা পেয়ে দেশান্তরী হয়ে আছে। গঙ্গার ধারে বাড়ী, একা মানুষ, খুব বিদ্বান, ফর্সা, ঢ্যাঙা, সুপুরুষ, চোখে চশমা—

তারা। থাক্, আর বর্ণনা করতে হবে না। বিন্দির ঠিকানা আমায় দে।

ভাই-বোনে কথা হবার পরের দিন তারামণি কাশীতে বিন্দুবাসিনীকে পত্র দিল। সাত দিন পরে জবাব এল, অভাগিনী লিখেছে,—

শ্রীচরণে শতকোটী প্রণামান্তব নিবেদন—

তারা দিদি, আজ আমাব অমানিশার মাঝে চাঁদ উঠেছে, আমার ঘর-ছাড়া সমাজ-ছাড়া বুঝি ধর্ম্ম ছাড়া ছন্ন-ছাড়া জীবনে তুমি দুযার ঠেলে এসেছ। এত মানুষ থাকতে এই মুখপুড়ীকে মনে করলে কেন, বোন? আমি সকল আপনাব জনেব কাছে মবে ছিলাম—পাথর-চাপা জীবনেব চেযে আমাব মরাই সুখের মনে হযেছিল। কিন্তু হাজাব দুঃসাহসী গোঁযার হলেও আমি বাঙালীব ঘরেব মেযে তো, এত বড় অকুলে একা ঝাঁপ দিতে সাহসে কুলিযে উঠলো না, তাই তোমার ভাইটীকে টেনে এনে তোমাদের দুঃখ দিয়েছি। আজ এই পাঁচ বছরে আমি অনেক ঠেকেছি, অনেক সয়েছি, তাই অনেক শিখেছি। আজ দবকার হলে, একা কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী, লাহোর করে বেড়াতে পারি। আজ আবার নতুন করে মরবার সাধ হলে একাই মরি, সঙ্গে সঙ্গে আর কাউকে ডোবাই না, কিন্তু সে দিন আমার কাঁচা মন, কাঁচা বয়েস। সত্যি দিদি, জীবনেও

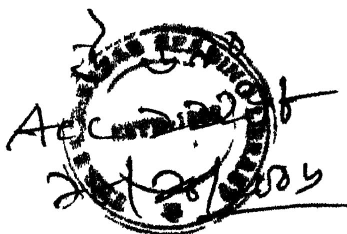
যেমন, মানুষ মরণেও তেমনি সাথী চায়, যে একা পথ চল্‌তে পারে, সে হয় দেবতা আর নয় পশু—মানুষে পারে না। তার মন প্রাণ চিন্ত হাজার টানে মাটির সঙ্গে বাঁধা, একা পথ চলা যে সব অবলম্বন খুইয়ে পাখীর মত আস্‌মানে ওড়া।

তুমি জিজ্ঞেস করেছ, এমন কাজ করলুম কেন? সে কথার উত্তর আগেই দিয়েছি, তোমাদের ঐ পাথর চাপা জীবনের চাইতে, এ আমার ঢের সুখের লেগেছিল। আজ আমার ওপর আমার অন্তর-দেবতা ছাড়া আর কারুর দাবী নেই, এ কি কম মুক্তি! তুমি বল্‌বে, "স্বামী"। কে আমার স্বামী, দিদি? আমার মনুষ্যত্ব আমার নারীত্বের অপমান করবার অধিকার তাকে কে দিল? ধর্ম্ম? তাহলে অধর্ম্ম কি? সমাজ? তাহ'লে দাসী-বেচার হাট কি? একাধারে আমার শিক্ষক, গুরু, বন্ধু, আমার বাবা মারা গেলেন, আর পাড়া-পড়সীর সঙ্গে পরামর্শ করে টাকার লোভে বনেদী বংশের লোভে, মা আমায় যার হাতে তুলে দিলে, সে কি পদার্থে তৈয়ারী, তা

তোমরা শুনেছ, জান না। আমি জানি, আমি ছ' মাস তার ঘর করেছি, আমার নারীত্ব আর মনুষ্যত্ব তাকে যথেচ্ছা পায়ে করে দলতে দিয়েছি। শেষে যখন একদিন রাত্রে আমার ঘরে এসে দেখলাম, নসিপাড়ার বামুনদের কচি বৌটা সেখানে কাটা পায়রার মত পড়ে ছটফট করে কাঁদছে, তখন আমার পাষাণে-বাঁধা ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তাকে চুরি করে বাড়ী পাঠিয়ে দিলুম, সকালে শুন্‌লুম, হতভাগী রক্ষিতদের পুকুরে ডুবে মরেছে। সেই রাত্রে আমি পালাই। একা পালাতে পার্‌তাম না, আমিও হয় তো তারি মত ডুবেই মর্‌তাম। কিন্তু কে প্রাণের মাঝে ডেকে বল্‌লো, "তোর পথ দেখাবার মানুষ পথেই পাবি।" তাই গয়নার পুঁটলি হাতে করে বেরিয়ে ছিলাম, নিজের অদৃষ্ট-দোষে তোমার ভাই আমারই মরণ-পথে দেখা দিল। আমি ঐ ভাঙা নৌকাই সম্বল করে ভেসে পড়লাম। যে সন্দেহ কাণা সমাজ করবে, তুমি তা করবে না, জানি, কারণ তুমি বুদ্ধিমতী, তুমি জান, কোন একটা

বড় ভাল কাজ বা মন্দ কাজ করবার শক্তি ওর নেই। তুমি বলেছ, এ মুখপুড়ীকে দেখতে আসবে। এসো দিদি। কাশী ত তীর্থ, সহজেই আসা যায়। আমার মুক্তির, সুখ একবার দেখে যাও, যার কাছে আছি, তার কথা চিঠিতে বলবো না। আগে তাকে চোখে দ্যাখো, তার পর সাক্ষাতেই সব বলবো। যদি জিজ্ঞেস কর, সে আমার কি, বলতে পাবি নে। এ সম্বন্ধকে আমাদের সমাজে প্রকাশ করবার ভাষা নেই। এ সমাজে কোন মেয়ে মানুষের এমন বন্ধু নেই!

ইতি তোমার বিন্দী।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এ কেমন মানুষ!

যখন তারামণি নিতান্ত নিম-রাজি পটলাকে এক রকম গ্রেপ্তার করে নিয়ে কাশীতে গিরীনের বাড়ী গিয়ে হাজির হ'লো তখন বেলা তিনটে। বিন্দু পটলকে আন্‌তে এক রকম স্পষ্টই বারণ করেছিল। অথচ তারা যখন তারই সঙ্গে এসে বিন্দুর সাম্‌নে দাঁড়াল, তখন তার মুখ গাল কাণ সব রাঙা হয়ে উঠলো, আয়ত নিবিড় চোখ দুটি কেঁপে উঠে পড়ে শেষটা প্রায় মুদে এল। মিনিটে সে সাম্‌লে নিয়ে তাহার হাত ধরে আসণে বসাতে বসাতে বললো, "এস দিদি, এস।" পটলের দিকে খানিকক্ষণ আর ফিরেও চাইল না। তারামণি এইটুকু দেখতেই ভাইকে নিষেধ সত্ত্বেও সঙ্গে এনেছিল। এখন তার এত দিনের মনের ধোঁকা কাটলো। পটল এতক্ষণ

নিতান্ত অপ্রস্তুতভাবে কামানো গোঁফে যেন কতই অন্যমনস্কে তা' দিচ্ছিল, এখন গিন্নীদের ঘরের দিকে আস্তে আস্তে সরে পড়লো। তারামণি বিন্দুর চিবুক ধরে বললো,—এখন বুঝেছ বোন, মেয়ে মানুষের মুক্তি নেই। বিধাতার রাজ্যে বুঝি পুরুষেরও নেই, তাই জ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা নারীর সতীত্বের আর একনিষ্ঠার এত মর্য্যাদা দিয়াছেন।

বিন্দু। ওটি তোমার ভুল, দিদি।

তারা। কি ভুল,—যা দেখলাম তাই ?

বিন্দু। (লজ্জিতভাবে) না, যা' বললে।

তারা। কি ভুল, বল ?

বিন্দু। সেই বাঁধনই সুখের, যে বাঁধন আমি নিজের আনন্দে নিয়েছি, শাস্ত্র ধর্ম্ম সমাজ তাই শুধু স্বীকার করে নেবে, তারই নাম বিবাহ,—সে মানুষ হাজার অপদার্থ হোক, সেই আমার স্বামী।

বলতে বলতে বিন্দুর কালো চোখে সন্ধ্যার গভীরতা ছেয়ে এল, সুখালস দৃষ্টি যেন বহু দিনের কোন্ হারানো পথের সন্ধানে চলে গেছে।

তাবামণি বললো,—তারপর? এ জীবন নিযে কি করবে?

বিন্দু। তা' তো জানি নে। ভাবনা করে কি হবে? আমি বেশ আছি।

পাশের ঘরে কার শান্ত পদবিক্ষেপ শোনা গেল, সে মানুষ যেন স্বপ্নে চল্‌ছে। বিন্দু গলার স্বর উঁচু করে ডাকলো,—রাঙাদা এদিকে এস, তাবা-দিদি এসেছেন।

যে এলো তার খুব বড় চোখ, ধাবালো নাক, ক্ষীণ পাৎলা ঠোঁট, চক্ষে গভীর তন্ময়তা, নিটোল সবল দীর্ঘ শ্যাম অঙ্গখানি ব্যেপে অপূর্ব্ব শান্তি ও শুচিতা বিরাজ করছে। গিরীন এসে নমস্কার করে মৃদুস্বরে বললো,—এয়েচেন বেশ করেছেন অনেক পরে টুনটুনি কথা বলার সঙ্গী পেল। আমার মত বোবা মানুষের সঙ্গে বাস করে সহজ মানুষ হাঁপিয়ে উঠে। আচ্ছা তোমরা গল্প কর আমি যাই।

এবার বিন্দু তারামণির মুখের দিকে কৌতুহল-

ভরা চোখে চেয়েছিল, গিরীন চলে গেলে জিজ্ঞেস করলো,—দেখলে, দিদি?

তারা। হুঁ।

বিন্দু। কেমন মানুষ?

তারা। খুব উঁচু দরেরই বটে।

বিন্দু। দেবতা, দিদি! ও দেবতা। নইলে আমার মত পাপের বোঝা খামকা মাথায় করে?

তারা। কেমন করে পরিচয় হলো?

বিন্দু। তোমার ভাইএর সঙ্গে এখানে পরিচয় হয়েছিল।

কীর্ত্তিমান পুরুষ এখান থেকে সরে যাবার আগে বুঝি একটুখানি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির তাড়ায় ওকে বলে যায়। তার পরদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে সরাসরি আমায় বললো, "আপনি আমার বাড়ীতে থাকবেন, চলুন।"

আমি। আপনার বাড়ীতে কে আছে?

গিরীন। কেউ না, একা আমি।

আমি। আমি এইখানেই থাকি, আপনি মাঝে

মাঝে এসে খবর নিয়ে যাবেন যে মরে আছি কি বেঁচে আছি।

গিরীন। তাতে দোষ কি? আপনি আমি খাঁটি থাক্‌লেই হলো, লোকের কথায় আমাদের কি এল গেল?

আমি। আমি নিঃস্ব, হাতের পয়সা সব খরচ হয়ে গেছে। আমার একটা রোজগারের উপায় বলে দিতে পারেন? কারুর বাড়ী দাসী বা রান্নার কাজ?

গিরীন। আমার কাছে অনেক টাকা আপনার গচ্ছিত আছে।

আমি। সে কি?

গিরীন। তা নয় তো কি। আমি একা মানুষ, কি করবো এত টাকা? আর ভগবান দেখুন, আপনাকে এখানে এমন অবস্থায় এনে ফেললেন, এই তো ইঙ্গিত যে ও টাকা কিছু আপনার কাজে লাগবে।

আমি। না, আমি খেটে খাব।

গিরীন। বেশ, আমার বাড়ীই খেটে খাবেন চলুন, আমি বাঁধুনী। আজই তাড়িয়ে দেব, আপনি রাঁধবেন।

দিদি, ও-মানুষ যা ধরে তাই করে। ওকে বোধ হয় কেউ "না" বলতে পারে না। এই তো আছি, একা মেয়েমানুষ, অথচ মনে হয় যেন কোন্ স্বর্গের মানুষেব সঙ্গে আছি—যাব সঙ্গে যেন মেযে মানুষের কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না। কচি ছেলেদের মত সরল, চোখে ওর দৃষ্টিই নেই তা' আমায় দেখবে কি। অথচ নীরবে আমার জন্যে সব করে, কিন্তু কিছু চায় না।

দেশে ফেববার দিন সজল চোখে তারামণি বিন্দুকে কোলে নিল, মাথায় হাত বুলিয়ে বললো,—দুঃখী মেয়ে, নিজের দুঃখের বোঝা আর বাড়িও না। এমন দেবতার সঙ্গ পেযেছ, তবু অপদার্থ একটা মানুষের জন্যে তোমাব বুকে পাষাণ চেপে আছে? তুমি না বুদ্ধিমতী?

বিন্দু অনেকক্ষণ অন্যদিকে চেয়ে রইল তারপর

বল্‌লো,—দিদি, নারীর হৃদয় কাণা। সে মানুষের ভিখারী, দেবতা নিয়ে কি কর্‌বে?

তারা। না বিন্দী, আমাদের দেশের মেয়েরা একদিন এমনি দেবতারই দেবী ছিল। আজ তাদের সে মহত্ব গেছে বলেই তাদের এত দুঃখ। তুই মুক্তি মুক্তি করিস, ভেতর থেকে মুক্তি না এলে নারীর মুক্তি কস্মিনকালেও নেই। মানুষের জন্মজন্মের পায়ের শেকল ঘোচাবে কে? সে শেকল যে প্রকৃতির দান! এমনি দেবতাই মুক্ত, মানুষ নয়, তা যত ভাল সমাজেই থাক।

বিন্দু। দিদি, তুমি ভুল করছ। ওর জীবনে প্রবেশের কোন পথ নেই, যে পথ আছে তা আমি পাই নি।

তারা। তা হলে নিজেকে নিয়ে কি কর্‌বি?

বিন্দু। কেন? আমি বেশ আছি। ছেলে-বেলা যাকে পেলে জীবন সুখের হতো, সে মানুষ নয়। তবে মিছে হা-হুতাশ করে কি হবে, দিদি?

মানুষ কি এতই বড় যে তাকে না হলে আমার চলে না? যিনি এ জীবন দিয়েছেন, এক দিন সেই বিশ্বনাথের পথ পাবো, আগে এম্নি নিরর্থক বসে বসেই হাজার সাধ আকাঙ্ক্ষার হাটগুলো ভাঙুক।

প্রেমে কত প্রেম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তারকদের গ্রামখানি বর্দ্ধমান জেলায়। বাড়ীর পাশে ঝোপ ঝোপ কলাগাছ ; পথে কত ডোবা পুষ্করিণী আমবন ; পথের ধারে বেড়ার তলায় তলায় কচু, কালকাসন্দা, দোপাটি, লজ্জাবতীর ভিড়করা ঘাসবন। সদ্গোপ কৈবর্ত্ত গয়লাদের খড়ে ও হোগলায় ছাওয়া মেটে ঘরগুলি নিকান পোতান দিব্য ঝরঝরে। পদ্মদীঘীর তীরে বাবা মকরনাথের মন্দির, দেয়াল তার ফাটা, মাথায় অশ্বত্থ গাছ।

এইখানে গ্রামের শান্ত নীড়ে শষ্পহরিত কোল-টুকুতে তারক আর তরীর স্বপ্ন—শৈশবকাল খেলা ধুলায় কাটিয়াছে। তখন তরী ডুরে সাড়ী পরা এতটুকু ফুটফুটে মেয়ে, ডানপিটে তারকের খেলার সাথী। তারকরা ব্রাহ্মণ, আর তরীরা বদ্দি।

অতটুকু বয়সে মাযের কোল ছাড়িতে না ছাড়িতে তার খেলার পুতুলঘর ভাঙিতে ভাঙিতে, কবে যে তরী হতভাগীর কপাল পুড়িয়াছিল, স্বামী যে কি ধন, তাহা শিখিবার জ্ঞান না হইতেই—পুণ্যলোভী বাপের গৌরীদানের ফলে মেয়ের সীঁথীর সিঁদুর, হাতের শাঁখা ঘুচিয়াছিল, তাহা না তরী, না তারক, দুই জনের কেহই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু যে দিন তাহা বুঝিল, দু'জনে এক সঙ্গেই বুঝিল; এ উহার মুখ চাহিয়া অন্তর দেখিয়া বড় দুখের বিনিময়ে বুঝিল।

তাহার পর তারক গ্রামছাড়া হইয়া কলিকাতায় তেড়ি কটিয়া, নোট মুখস্ত করিয়া, অকর্ম্মণ্য বাবু-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে আসিল; আর শৈশবের পুতুলখেলা সারিয়া, কৈশোরের সেই সাথীটির অনাবিল সঙ্গসুখটুকুও হারাইয়া, বনের মেয়ে বনেই বড়িতে লাগিল। ছেলেবেলা তরী লুকাইয়া তার-কের মার কাছে আসিয়া জোর করিয়া তারকের পাতে মাছ খাইয়া যাইত; এখন সে স্বপাক হবিষ্যান্ন

খায়। আগে এতটুকু তুধেব মেয়ে বলিয়া মা অনেক কাঁদিয়া কাটিয়াও প্রাণে ধবিয়া হাতের চুড়ি, নাকের নোলক খুলিয়া লইতে পাবেন নাই, এখন সে নিবা-ভবণা বিষাদ-প্রতিমাব সর্ব্ব অঙ্গ প্রকৃতিরাণীর দেওয়া গহনায় ভরা।

তারক মুক্ত কর্ম্মবহুল পুরুষ-জীবনে সব ভুলিতে পারিয়াছিল; তবীর বঞ্চিত সঙ্কীর্ণ নাবী-জীবনে ভুলিবার বড় কিছু ছিল না। ভগবান মন গডিয়াছেন, আর মানুষ সমাজ গড়িয়াছে; সবাব পবিত্যক্ত এমন যে বৈধব্যের শ্মশান, সেখানেও মধুঋতুব স্পর্শ সকল কিছু ছুঁইয়া সবুজ করিয়া দেয়, একি বিড়ম্বনা!

তারকের মা তরীর রূপ দেখিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইত; তরীর মা ছলছল চোখে অঞ্চলে সইএর চক্ষু মুছাইয়া বলিত,—"ছি বোন্! করবি কি বল্? ওর পোড়া অদেষ্ট, আর এই কসাই সমাজ। নে ভাই, আমায় আর কাঁদাস্ নে।" তাহার পর দুঃখিনী পোড়াকপালী মেয়েটা রান্নাঘরের ভিজে

দাওয়ায় আঁচল বিছাইয়া ঘুমাইয়াছে দেখিয়া দুই সই বসিয়া বসিয়া মনের সুখে কাঁদিত।

যে বৎসর তারক ডাক্ কলেজ হইতে বিএ, পাশ দিয়া গ্রামে আসিল, তাহার ছয় মাস পূর্ব্বে কলেরায় তরীর মা মরিয়াছে, এখন সে ভাই হরিপদর সংসারে বিনা মাহিনার দাসী। সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি ঘর নিকায়, বাসন মাজে, জল আনে, রাঁধে, দাদার ও বৌএর প্রাণপাত করিয়া সেবা করে, আর দিনান্তে একবার দুটি হবিষ্যান্ন রাঁধিয়া খায়। তবু পোড়ারমুখীর রূপ আর ঘোচে না; এত অবহেলায় দুঃখেও ছিন্নবস্ত্র পরা দেহে "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়।" যেখানে যাহা আদৌ দরকার নাই, সেইখানে কি ছাই তাহাই এমনতর অপর্য্যাপ্ত ঢালিয়া দিতে হয়! এ জগল্লীলার রঙ্গ-রাজের রঙ তামাসাই কি এমনি! পাঁক, শ্যাওলা, কাঁটা আর সাপের রাজ্য, তাহার মাঝে রূপের খনি মধুসুগন্ধভরা কমলের সৃষ্টি; "নীল জলের অতল তলে যেখানে কেউ দেখিবে না, সেইখানে কিনা

মুক্তা ও প্রবালের রাশি ; কালো কয়লার বুকে হীরা ! জগতের ঠাকুর অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় ; তাহার লীলাও আবার তেমনি।

তখন গ্রামে জায়গায় জায়গায় আখ মাড়াই হইতেছে। দ্বিপ্রহর বেলা ; গ্রামখানি আলস্যে শ্রান্ত, আধ ঘুমে নিশুতি বিজন। পাঁজর-কণ্ঠা-বাহির-করা দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হাভাতের মত হরিপদর ইঁটজিরজিরে পাকা বাড়ী খানিতে বোধ হইতেছে যেন কেহ কোথায়ও নাই। তরক আজ প্রাতে আসিয়াছে, বাড়ীতে দু'মুঠা ভাত কোন রকমে মুখে গুঁজিয়া বড় তাড়াতাড়ি বাহির হইয়াছে। ইচ্ছা গ্রামখানি একবার ঘুরিয়া দেখিবে, আর যে কি ইচ্ছা, সে বলিয়া কাজ নাই। অনেক দিন পর আজ তাহার সে সাধ মনে পড়িয়াছে। হরিপদর বাড়ীতে অন্দরের উঠান বাহিয়া এক পাশের ঘরটিতে উঠিতে হয়, সেইটিই বৈঠকখানা ; নামিতে উঠিতে গলা খাঁকারী দিয়া না আসিলে যাইলে; মেয়েরা পলাইয়া লুকাইবার সময় পায় না। হরি-

পদর বিবাহে তো তারক আসেই নাই, আজ সাত বৎসর পর গ্রামে তাহার এই প্রথম আসা। বাল্যের পুরাতন বড় পরিচিত, তবু আজিকার এই নূতন পাতা অজানা সংসারে সে কাহাকে ডাকিবে? বাহিরে দাঁড়াইয়া শ্যাওলাপড়া দেওয়াল ধরিয়া সে এক আধবার কাঁপা চাপা গলায় ডাকিল,—"হরিপদদা বাড়ী আছ?" হরিপদ তখন জমিদার শশীবাবুর কুমারদের আড্ডায় তাস খেলিতে ব্যস্ত, ঘরে বৌ খোকাকে লইয়া মাদুর পাতিয়া ঘুমে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ইতস্ততঃ করিতে করিতেও তারক ফিরিতে পারিল না। বাল্যের সুখ-স্মৃতি অনেক দিনের পর আজ এই ইটবাহিরকরা জীর্ণ ঘর খানি হইতে স্নিগ্ধ অনাহূত পুষ্পগন্ধের মত তাহার মন প্রাণ আকুল করিয়া লইতেছিল। কলিকাতার ফুলবাবুর বিলাস-মন্থর নিরর্থক তামস জীবন, তাহার পর এ যেন প্রথম সচন্দনবিগ্রহে উজ্জ্বল পবিত্র দেউলখানিতে পদক্ষেপ; কতকাল পথের রৌদ্র

সহিত ধূলা আবর্জ্জনা ঠেলিয়া এ যেন ঈপ্সিত গঙ্গার শীতল স্নিগ্ধ অবগাহন। হউক ভাঙ্গা জরাজীর্ণ, হউক বনে বনময় সবার পরিত্যক্ত, তবু এ গ্রামের কোল ঠাণ্ডা করা শান্তির ভারে কেমন নিথর ও মনজুড়ান, তাহার উপর আবার সেই নিষ্কলঙ্ক সুখের স্মৃতি এমন মধুকেও মধুর করিয়াছে। এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে তারক দেখিল, একটি মেয়ে সেই বাগাতে আসিতেছে। নিরাভরণা মেয়েটির মাথায় কাপড় নাই, ভিজে এলো চুল, সর্ব্বাঙ্গভরা তরতরে যৌবন আর রূপের নদ, অসঙ্কোচ দার খালো চোখে বড় সাহস ততোধিক কৌতূহল। তাহার দিকে নির্ণিমেষ চলে চাহিতে চাহিতে কাছে আসিয়া তবীর পা আর চলিল না, মুখ গণ্ড সব রাঙ্গা হইয়া উঠিল, ওষ্ঠ উদ্ভিন্ন হইয়া কথা ফুটিয়াও ফুটিল না। তারকের মন বসন্তের অলির মত গুঞ্জরিয়া কেবলই বলিতে লাগিল,—"সেই এই হ'য়েছে।" এদিক ওদিক দেখিয়া সহসা নত হইয়া ঢিপ করিয়া তারকের পায়ের গোড়ায় প্রণাম

করিয়া দুই হাতে পায়ের ধলা মাথায় লইয়া তরী বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। তারকও পলাইল।

তারক বার্ডসাই খাইত; পথারাব খোপের মত তেড়ি কাটিত, *গিলে কোঁচান গিহি ধুতি চাদর পিরাণ পাম্পা-সুতে পাতলা কালো দেহখানিকে বড় যত্নে ফতো বাবু করিয়া সাজাইয়া তুলিতেছিল। আজ সব ভুলিয়া, বাড়ী গিয়া, উঠানে মায়ের কাছে বসিল। মা মাতুর বিছাইয়া পা ছড়াইয়া মুখে গুল দিয়া সুপারি কাটিতে বসিয়া ছিলেন; ছেলেকে দেখিয়া বলিলেন,—"গাঁ ঘুরতে গেলি, এত শিগ্‌গির এলি যে? ক্ষান্তপিসির ওখানে গিছিলি? আর হরিপদদের ওখানে—?" ছেলে হেঁট মুখে গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল, কেন উত্তর করিল না। তারকের মা দুর্গামণি বড় বুদ্ধিমতী; ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন,—"আহা তোর সেই খেলাব সাথী তরী—এখন আর ওকে চোক মেলে দেখা যায় না। পোড়া বিধি বড় পাষাণ রে, এমন মেয়ের কপালে এত দুঃখুও লেখে!

কিছু বুঝলে না, দেখলে না, এই বয়সে অমন সোণার পিরতিমে যোগিনী সাজলে। হাঁ রে তারক, বিদ্দে-সাগর না কে নাকি বিধি দিয়েছে, বিধবার বে হয়? সিদিনকে চন্দনার মিত্তিরদের বিধবা মেয়ে জগদম্বার বে হ'লো। ওহ্। মা গো মা। সে কি ঘোট পাকান, সারা গাঁটা ভরে কি কোঁদল। নিন্দেয় কাণ পাতবার জো নেই, মাগী মিন্‌সেদের না খেয়ে দেয়ে কেবল ঐ কথা, ঐ কুচ্ছো। বাপরে বাপ, পরের দুঃখে কোথায় সহায় হবে, না এত ঝাঁটা নাতিও মাত্তে পারে। ধন্যি তোদের সমাজ। তোরা ছাই পাঁশ কি নেকা পড়া শিখিস রে? এই ঘোঁট পাকানর একটা হিল্লে কত্তে পারিস্ নে?"

আমাদের হিন্দু সমাজে মেয়েরাই আচার নিষ্ঠার রক্ষী; কিন্তু প্রেম ও স্নেহ বাঁকা মনকেও সরল করে; বুদ্ধি দিয়া অনেক বিচার করিয়া যাহা বুঝিতে হয়, প্রেমে সে জ্ঞান সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত! দুর্গামণি সইএর মেয়ে তরীকে আপন পেটের মেয়ের মত ভাল-বাসিয়াছিল; তাই তাহার দুঃখ সে যেমন বুঝিত, আর

কেহ তেমন বুঝিত না। তরীর কিন্তু কোন দুঃখ নাই ; পিঞ্জরের পাখী তাহার সেই লোহাঘেরা বাধনটুকুকে ভালবাসিয়া ফেলে ; পাখীটাকে বাহির করিয়া পিঁজরার দ্বার বন্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিলে, সে ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া সেই বন্ধ দুয়ারে গিয়া দাঁড়ায়। অবাধ অনন্ত নীল মুক্তি তাহার কাছে ভয়ের সামগ্রী ; বন্ধনটা বেশ পরিচিত— সহজ, তাই শান্তিময়। তরী দিবারাত্র মনের সুখে খাটিত, খোকা কোলে পায়ের উপর পা দিয়া বৌদি'র ঝাঁঝাল তর্জ্জন গর্জ্জন হাসি মুখে সহিত, থপথপে মোটা সাদাসিধা ভোলানাথ গোছের দাদাটিকে প্রাণ দিয়া যত্ন করিত ; কিন্তু নিজের জীবনে যাহা নাই তাহার দুঃখ বুঝিত না। স্নেহময়ী দুর্গামণি কিছু বলিলে, তাহার ব্যর্থ যৌবনের দুঃখে কাঁদিলে, সে লজ্জা পাইত ; তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া তাঁহার কোলে শুইয়া পড়িত। তাহার বউদিদি কেষ্টকালী বড় সেয়ানা মেয়ে, সেই গৌর গোলগাল বর্ত্তুলের মত দেহটি আর চঞ্চল তীব্র চক্ষু দুইটি ভরিয়া তাহার ক্ষুরধার বুদ্ধি নাচিয়া

ফিবিত। ভালমানুষ হবিপদকে সে চিনিত, তাই ঠাকুবঝিকে শাসন কবিবাব লোভ সে কত্তা বাড়ী থাকিলে সংযত বাখিত, গলায মধু ঢালিযা ডাকিত, "ঠাকুবঝি, খোকাব দুধটা দিযে যাও না, ভাই।" স্বামীব কাছে দাঁড়াইযা বান্না ঘবেব দিকে চাহিযা সনিশ্বাসে বলিত, "আহা। ঠাকুবঝিই যেন খোকাব পোষ মা হয বসেছে গো, কি যত্নটাই না কবে।" স্বামী নিকটে না থাকিলে ঝঙ্কাব দিযা বলিযা উঠিত,—"ওমা। থালা বাখবাব ছিবি দেখ? বাসন কোসনগুলো আছড়ে আছড়ে ভাঙ্গলে।" আব কোন ছুতা না পাইলে বলিত,—'ভাই বাপু বোনেব কথায অজ্ঞান। আমি যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছি। পানে চুনে মিশে গেল, ববজেব বোঁটা ববজে বইল। ঢেব ঢেব মেযে দেখেছি বাপু, এ সব মেযেব হাতে পাযে কথা কয। সোযামী তো জন্মে এস্তক খেযেছে, এখন আমাদেব খেলেই হয আব কি।"

তবী বান্না ঘবে বসিযা ভ্রাতৃবধুব এই গঞ্জনা

কটুক্তির সহিত ভাইএর আদরের ভাত খাইত, আহা-রান্তে সব গুছাইয়া রান্না ঘরে শিকল দিয়া আসিয়া খোকাকে লইয়া হাসি মুখে বলিত,—"বৌদি' তুমি একটু ঘুমোও, আমি খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে আনি।" বউদিদি তেলে জলে পুষ্ট নধর দেহখানি মাদুরে ঢালিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিত, "তবু যা হোক, আমার দরদ দুঃখু মনে পড়লো। আমি বলি আজ আর হাত আজাড় হবে না।"



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তরী ছেলেবেলা হইতে হরিপদর কাছে বাঙ্গলা লেখাপড়া শিখিয়াছিল, বৈষ্ণব পদাবলী, চৈতন্য ভাগবত ও চরিতামৃতের আপনাভোলা কান্ত ভাবের মাধুর্য্য তাহার সহজে প্রেমপ্রবণ চিত্তকে আরও কোমল আরও প্রেমোন্মুখ করিয়াছিল, যে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের শোধনে এ প্রেম ভগবানে আপনা আপনি অর্পিত হইয়া যায়, তাহা সে সংসারের দুঃখ কষ্টে এই সবেমাত্র শিখিতেছিল। শেখা সম্পূর্ণ না হইতেই শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতির সুখাবেশ লইয়া তারক অতর্কিতে তাহার মনোজগতে আসিয়া দাঁড়াইল। বসন্তের সমাগমে লতার অঙ্গে রস, ফুলের বুকে ফুটিবার আকুলি ব্যাকুলি আপনি আসে; শীতের সংযমে যোগিনী বনবাণী মাথা নাড়িয়া শাখা কিশলয় দোলাইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় কোন মতেই হরিত যৌবনজোয়ার রুধিতে পারে না। তরী অধীর হইয়া

ভয়ে বিস্ময়ে কণ্টকিত শরীরে ভাবিতেছিল, "হে ঠাকুর! এ আমার কি হ'লো? ওগো, রক্ষা কর।" তারককে দূর হইতে শুধু একবারটি দেখিলেই অমৃত-সিঞ্চনে তাহার সর্ব্বশরীর জুড়াইয়া যায়, আরও একটু কাছে পাইলে জ্ঞান থাকে না, ভয়ে প্রাণ কণ্ঠাগত হয়। সে প্রাণপণে পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইত, পারত পক্ষে তারককে দেখা দিত না।

তারক গ্রামে বসিয়া কয়েক দিন গালে হাত দিয়া কি ভাবিল। সেই কৈশোরের নির্ম্মল খেলাধূলাটুকু সারিয়া কলিকাতা যাওয়া অবধি সে আর কখন পরের জন্য এমন করিয়া ভাবে নাই। বাসনা আর নিঃস্বার্থ দয়ার আজ এ কি সংগ্রাম! নীরব তারকের বুকের মধ্যে স্নিগ্ধ জোৎস্নামাখা নিশায় কালবৈশাখীর ঝড় বহিতেছিল। মেঘের পুঞ্জে পুঞ্জে কামনার রক্ত বিদ্যুজ্জিহ্বা আর গর্জ্জন, আবার সেই তাল তাল কালোর ধারে ধারে করুণ র চাঁদিনীর আঁকা শাদা জ্বলজ্বলে জরির পাড়। হরিপদদা'র

সহিত একদিন তাহার এ সম্বন্ধে আলাপ হইল, সব কথা শুনিয়া শিহরিয়া ভয়ে এতটুকু হইয়া গিয়া হরিপদ বলিল,—"আরে সর্ব্বনাশ। তাও কি হয়? বিধবার বিয়ে। আমাদের তরীর—আরে ছ্যাঃ।"

তা। যার মনে জ্ঞানে কখন স্বামিগ্রহণ হয় নি সে যে কুমারী। তুমি হিন্দু, ধর্ম্ম আচরণ কর, লোকে যা খুসি বলুক না।

হরি। আমায় যে একঘরে করবে?

তা। তা' কি করে করবে, এ যে হিন্দু সমাজে চলে গেছে।

হরি। কৈ আর চলেছে, সে ত দুই একটা। আর তাদেরও কি রকম লাঞ্ছনাটা হয়?

তা। দু' একটার বেশী হয় না, সে তো তোমার আমারই দোষ। লাঞ্ছনার ভয় কর, তুমি পুরুষ বাচ্চা নও?

হরিপদ ধমক খাইয়া আর বাঙনিষ্পত্তি করিল না, নীরবে বসিয়া ভুড় ভুড়, ভুড় ভুড় করিয়া তামাক টানিতে লাগিল।

তারক যাহাকে তরার বর ঠিক করিল, সে খেড়োর রামকমল সেন, সবে বি এ পাশ দিয়া ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। ঘরে বুড়োর দল নাই, সেই কর্ত্তা ; তাহারা বেশ বড় লোক, সুন্দরবনে তালুক আছে। শুনিয়া হরিপদর লোভ হইল, কিন্তু ভয় হইল ততোধিক। কথাটা যেই রটিল, গ্রামে আগুন লাগিয়া গেল আর কি! ভবতারণ স্মৃতিতীর্থ কুব্জ দেহখানি লইয়া লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে চটি পায়ে আসিয়া তারককে বলিলেন, "কি হে ছোকরা, একেবারে গোল্লায় গেছ? নিজে নরকস্থ হবে, গ্রামশুদ্ধ নরকস্থ করবে দেখতে পাচ্ছি; তোমাকে চটি পেটা করে আক্কেল দেয় এ রকম কেউ এখানে নেই?" বুড়ার ঠোঁট বার্দ্ধক্যের বশে স্বভাবতই কাঁপিত, এই অস্বাভাবিক উত্তেজনায় সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। তারক সংযত হইয়া থাকিলেই ভাল হইত, কিন্তু জুতা পেটার কথায় ইংরাজি পোড়ো ইয়ং বেঙ্গল তাহা সহ্য করিতে পারিল না; নাক সিটকাইয়া বলিল, "অপধর্ম্মের রক্ষক জুতো হাতে বামুন ছাড়া আর কে হবে?"

ভব। (চিৎকার করিয়া) বেহায়া, বেল্লিক স্ত্রী, নিজে ম্লেচ্ছ হয়ে হিন্দুর জাত ধর্ম্ম নষ্ট করতে এসেচ? তোমায় আমরা দেখে নেব। আর হরিপদর হুঁকো, নাপিত বন্ধ না করাই তো আমার নাম ভবতারণ স্মৃতিতীর্থ নয়।

মেয়েদের হাসি টিটকারী গঞ্জনায় তরীর ঘরের বাহির হওয়া দায় হইল। যে বৌদিদির বাক্যবাণ সে আশীর্ব্বচনের মত শিরোধার্য্য করিত, আজ ধৈর্য্য হারাইয়া তাহা বিষবৎ হইতে লাগিল। একদিন রাত্রে অন্ধকারে আসিয়া সে তারকের মায়ের পায়ে উপুড় হইয়া পড়িয়া বড় কান্না কাঁদিল। দুর্গামণি অনেক বুঝাইলেন, শেষে তারককে ডাকিয়া দিয়া রান্নাঘরে গিয়া বসিলেন, বলিয়া গেলেন "বাবা! আমি ত আর পারি নে, মেয়েটা কেঁদে কেঁদে আধ-মরা হয়ে গেছে। তোর ও খেলার সাথী, তুই যা হয় কর।" তরী আজ মোরিয়া হইয়া আসিয়াছিল, তারকের সকল কথায় কেবল অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিল। শেষে সে দৃশ্য সহিতে না পারিয়া তারক

চলিয়া যায় দেখিয়া সে মাথার কাপড় ফেলিয়া তাহার দুইপা জড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারক বলিল "তরি! লক্ষী দিদি আমার—।", তরী বাধা দিয়া ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে কোন রকমে বলিল,—"তুমি কলকেতায় চলে যাও, ওগো তোমার পায়ে পড়ি, যাও।" সে দৃষ্টিতে দুই জনের কাছে দুই জনের মন ধরা পড়িয়া গেল, যাহা এতদিন অব্যক্ত ছিল তাহা বলিতে আর বাকি রহিল না।

এ কথায় তারকের মনের কোথায় ঝন্ করিয়া যেন একটা শিরা ছিঁড়িয়া গেল। যাহার সুখের জন্য সে সব করিতে পারে, তাহার হিত করিতে গিয়া সেই কিনা এমন মর্ম্মন্তুদ দুঃখের মূল হইল! তারক শেষরাত্রে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিল। রেলওয়ে ষ্টেসন সেখান হইতে দশ মাইল দূর, পথের মধ্যে পাঁচাল পাড়ার বিল আর আম বন, কাছেই কেশার মাঠ। অত সকালে বিলে

বুনো বেনে হাঁস আর চকাচকি ডাকিতেছে। যাহাকে সুখী করিতে এত উদ্বেগ, এত কঠিন আত্মঘাতের কল্পনা, আপনার কলিজা টানিয়া ছিঁড়িয়া পরকে দিবার চেষ্টা, তাহাকে না জানি কত কালের জন্য ছাড়িয়া যাইতেছে। তবু তারকের বুকের মধ্যে একটা শীতল সর্ব্বসন্তাপহারী পিণ্ড মন প্রাণ জুড়াইয়া বিরাজ করিতেছিল। এ বিরহেও সুখ, বুঝি মিলনের অধিক সুখ; কারণ সে আর পর হইয়া যাইবে না। আর সেই দৃষ্টি—অশ্রু-সজল মনকাড়া বুকের গোপন ভাষাভরা ভাবস্তব্ধ প্রেমকরুণ সেই দৃষ্টি। মুখের কথায় আর মানুষ ইহার অধিক কি বলে! তরীর অত প্রেমের ধারা এক নিমেষে তারকের চিত্ত ধুইয়া বিমল করিয়া দিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল, সে এত পাইয়াছে, যে আর চাহিবার কিছু নাই; সমাজের নিয়মে তরী চিরদিনই তাহার পর, কখন আপনার হইবার নয়। কিন্তু দেহ কতটুকু? মন যে ভূমা, সেই ভূমা মহান্ অনন্তের কোলে যে চিরমিলন হইয়া গিয়াছে।

সুখে ন ভাল তারক যার আর পালো এমন ঘোরায় ঘোর তরঙ্গের বেগে দিয়া টানিতে টানিতে যাইতেছে, হঠাৎ একটা ঢেউ আসিয়া তাহার মাথায় প্রচণ্ড বেগে লাগিল, চক্ষে অন্ধকার হইয়া পড়িয়া জ্ঞান হরিয়া লইল। যখন জ্ঞান হইল, তখন সে মাটিতে সেই তলার ভিজা ঘাসে পড়িয়া আছে, আর তাহার সর্বাঙ্গে অবিশ্রান্ত অনেকটা লাঠির মার পড়িতেছে। যে জ্ঞান এক মিনিটের জন্য হইয়াছিল, তাহা লাঠির প্রহারে তখনি আবার গেল। দুই ঘণ্টা রাত্রের পর আবার যখন জ্ঞান হইল তখনও সে সেই ঘাসে রক্তে ভিজিয়া তেমনি পড়িয়া আছে, খোকার রামকমল কাঁদিয়া তাহার মুখ দেখিতেছে। রামকমল বলিল,—"দাদা, একি? তোমার এ দশা কে করলে?" তারক হাসিল, বড় সুখে হাসি পাইয়াছিল, বলিল,—"ভাই, আমার বড় আত্মজনে করেছে।" উঠিতে গিয়া তারক পড়িয়া গেল। রামকমল ডুলি আনাইল, তারকের কাকুতি মিনতিতে তাহাকে আর খেড়োতে লইয়া গেল না, কোলে করিয়া রেল পথে কলিকাতায় লইয়া

আসিল। রামকমল অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া বলিয়াছিল,—"দাদা, তোমার এ দশায় মা ছাড়া আর কার কাছে নিয়ে যাব, কে সেবা কর্‌বে?" তারক উত্তরে বলিয়াছিল,—ভাই, সেবা আমার শ্রীহরি কর্‌বেন, আমি এ যাত্রা মরছি নে। তুমি একবার প্রকৃত সুহৃদের কাজ কর, আমায় কলকেতায় পৌঁছে দাও!"

রাম। তারা শুনলে কি ভাব্‌বে?

তা। তারাই আমায় কলকেতায় যেতে বলেছে, তাঁর কাজেই যাচ্ছি।

রাম আর কিছু বলিল না; তাহাকে লইয়া কলিকাতায় আসিল, এবং দুই মাস থাকিয়া নানা চিকিৎসা করাইয়া তারককে সুস্থ করিয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীশ্রীচরণ-কমলেষু,—

আমি এখানে আছি; কারণ গ্রামে এ পোড়া-কপালীর ঠাঁই নেই। লোকে যা' বলে তা' আমি নই এ কথা তো তোমাকে ব'ল্‌তে হ'বে না; সেই সাহসে পত্র লিখলাম। তোমার ছেলেবেলার খেলার সাথী তরী আজ অনাথিনী, কিছু টাকা পাঠাও এই ভিক্ষা; পরের কাছে অনেক চেষ্টা করেও চাইতে পারি নি। মরহরির ঘাট, তুলসী বৈষ্ণবীর বাড়ী এই ঠিকানায় পাঠালে পাব। ইতি প্রণতা তরী।

পত্র পড়িয়া তারক অশ্রু রুধিতে পারিল না, ব্যাগ কাপড় চোপড় দু'চার খানা গুছাইয়া লইতে জলভরা চক্ষে দেখিয়া লওয়া কঠিন হইল; বড় কষ্টে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া ব্যাগটা হাতে বাহির হইয়া পড়িল। তারক এখনও

ফুল বাবুটি, পাম্প সু বাঁকা টেড়ি, এসেন্স, ছড়ি, ঘড়ি কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি নাই। এত তাড়াতাড়িতে এবং বেদনাকম্পিত দশায় যাই যাহ করিয়াও এত দিনের অভ্যাসে হাত পা তার আপন মনে চুল সই করিয়া চাদর কাপড় গুছাইয়া পরিয়া লইল।

তারক নবদ্বীপে কখনও যায় নাই, শুধু নবদ্বীপ কেন স্বগ্রাম ছাড়া সম্ভবে কূপমণ্ডুক সে বাঙ্গলার মাটি কোথাও মাড়ায় নাই। তাহার উপর তুলসীর সেই ভিজা গোবরনিকান ঘুঁটের ধুঁয়ায় ভরা ঘর, অত সকালে তখন তরী স্নান করিয়া আসিয়া সিক্ত বস্ত্রে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া গোবিন্দ প্রণাম করিতেছিল, মাথা তুলিয়া তারককে দেখিয়া লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া জড়সড় ভাবে পলাইল। তুলসী আথা ধরাইয়া উনান নিকাইতেছিল, সে গোবর মাখা হাতে কোমর বাঁধিয়া তেমনি প্যাট প্যাট করিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; হতভম্ব তারককে উস্‌খুস করিতে দেখিয়া বলিল,—"তুমি কে গা? মেয়ে নোকের বাড়ী ধড়মড় করে ঢুকে পড়?"

ততক্ষণে কাপড় ছাড়িয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা তরী আসিয়া তারকের পায়ের ধূলা লইল; দাওয়ায় আসন বিছাইয়া দিতে দিতে অধোমুখে বলিল,—"ও ভাই আমার দেশের লোক, তুমি চট করে রান্না চড়িয়ে দাও গে, তিন জনের চাল নিও।" মুচকী হাসিয়া তুলসী চলিয়া গেল, তরী মরমে মরিয়া এতটুকু হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারক উদ্ধনেত্রে বিহ্বলভাবে এত দিনের কামনার বস্তু দেখিতেছিল, বলিল,—"তরি। তুমি এখানে এমন দশায়?"

তরী পদনখে মাটি খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, "আমি তো টাকা চেয়েছিলুম।

তা। টাকা এনেছি।

সে এক তাড়া নোট বাহির করিয়া দিল, তরী খুলিয়া তাহার দুইখানি লইয়া বাকি মাটিতে তারকের পায়ের কাছে নামাইয়া রাখিল, সসঙ্কোচে বলিল,— "আমার এতেই হবে।"

তা। সে কি?

"তুমি সন্ধ্যার গাড়িতে যাবে তো? যাই, তোমার জন্য খবর আনিগে" বলিয়া আস্তে আস্তে তুলসী চলিয়া গেল। ক্ষণেক পরে আঁচলে মেঝে মুছিয়া জল ছড়া দিয়া তরী একখানি রেকাবীতে মুড়কি ও বাতাসা দিয়া গেল। তারক হাত পা ধুইয়া সেই গরীবের তুচ্ছ জলখাবার কতক খাইল, রোজ সন্দেশ রসগোল্লায় তৃপ্ত রসনা আধপথে জবাব দিয়া বসিল, গুড়ের মুড়কি তো তাহার অচল। ক্ষিপ্র হাতে সজনে ডাঁটার চচ্চড়ি, থোড়ের ডালনা ও বড়ি ভাজা দিয়া রুকড়ি চালের মোটা মোটা ভাত, তারক আনমনে অনেকটা খাইল। আজ তাহার মধ্যে দুইটা মনের ঠেলাঠেলি বাধিয়াছে। একটি মন এ কুঁড়ে ঘরে অর্দ্ধাসনে এত দুঃখেও বড় তৃপ্ত, বুঝি সংসারের বাস্তব সুখেও উদাসীন, আর একটি মন সে জমজমাট আনন্দের মেলায়, কিছু বলিতে পারিতেছে না, কেবল পেছু পেছু খুঁৎ খুঁৎ করিয়া ফিরিতেছে।

সন্ধ্যার সময় তুলসী হাটে গেলে, তরী আসিয়া তারকের শুইবার ঘরের দরজায় বসিল। তারক

এতক্ষণ মনের কথা বলিতে না পাইয়া কণ্টকশয্যায় ছিল, এখন এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিল, "তুমি আমার কাছে চল। এখানে এই দুঃখে তোমায় কি করে রেখে যাব?" তরী কিছু বলিল না, শুধু শান্ত মগ্ধ চক্ষে বড় তিরস্কারের করুণ দৃষ্টি হানিয়া চাহিল। তারক তাহাও সহিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল। সমাজ যাহাকে এমন মরণের বাড়া কলঙ্ক দিয়াছে, তাহার সমাজের কাছে কি বাধ্যবাধকতা আছে? অনেকক্ষণ তরী কিছু বলিতে পারিল না। শেষে ভাবিল, এখনি তুলসী আসিয়া পড়িবে; হয়তো উত্তর না পাইলে তারক আজ যাইবে না। তরী লজ্জার মাথা খাইয়া হেটমুখে বলিল,—"ছি! তোমার মুখে এই কথা! ওরা মিথ্যে কলঙ্ক দিয়েছে, তাই সত্যি ক'রবো? তাদের মুখের চুণ কালী তোমার মুখে—"

তারক স্তব্ধ হইয়া রহিল। দুই জনে অনেকক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া এ উহার দিকে চাহিতে পারিল না। শেষে তারক জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছিল?"

তরী। গুরুজনের কথা, কি করে এ পোড়া মুখে বল্‌বো? একদিন রাত্তিরে ঘুম ভেঙে দেখি বাড়ীতে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে গেছে। গাঁয়ের বগলা পিসি আর বৌদি' দাদাকে বল্‌লে, "ও চিঠি তরীর।" সবাই ঘুমালে আমি রাত্তিরে একবস্ত্রে চলে এয়েছি। বড় পোড়া কপাল, মরতে গিয়েও মরণ হ'লো না।

তা। কেন, যার চিঠি তার নাম বল্লেই পারতে।

তরী দাঁতে জিব কাটিল, বলিল, "ছি! তাও কি হয়। সে এয়োস্ত্রী, দাদার সংসার পুড়ে ছাই হয়ে যেতো। আমার আর জীবনে কি বাকি আছে, বল? দুঃখ কষ্ট মাথা পেতে নিতেই তো বিধবার জীবন।

তা। গঙ্গায় ডুব্‌তে গেলে কেন?

তরী। তখন কিসের জন্যে আর বাঁচ্‌বো?

তা। এখন কেন বেঁচে আছ?

তরী। দেবতা ছুঁয়ে গেছে,—তার পর থেকে বুকটা ভরে রয়েছে। তুমিও যেও; গয়ায় রাম-শিলায় থাকেন, গেরস্তলোক।

তারক মনে মনে বড় রাগিয়াছিল; প্রেমের প্রথম রূপ বাসনাত্মক; সে দয়িতের মনের বৃন্দাবন বুঝে না; বাঘের মত লোলুপ হইয়া আহারের জন্য ঘোরে; কেবলি আত্ম উদর পূর্ত্তির লালসায় গ্রাস করিতে চায়। সে লোভী, সে না পাইলেই হিংস্র পশু হয়। ক্রোধ বিকৃতকণ্ঠে তারক বলিল, —"সে সাধু, ভালবাসার সে কি জানে?

তরী। ছিঃ! সাধু নিন্দে করতে নেই। ভালবাসা আমরাই শিখি নিক, বাবাই ঠিক প্রেম জানেন। তিনি বলেন,—"প্রেম কি গলি বড়ি শাগরি" (সরু বা সঙ্কীর্ণ), সব না ছেড়ে একেবারে আপনা ভুলতে না পারলে সেখানে যাওয়া যায় না।

তা। বিধবার কি বিয়ে হয় না? বিদ্যাসাগর—

তরী। বিধবার হয় জানি, কিন্তু বামুন বদ্দি! ছিঃ! আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি, ওগো আমায় অমন তর কথা সব বোলো না।

আরক্ত মুখ ঢাকিবার জন্য তরী মাটিতে সেইখানে লুটাইয়া পড়িল। তারক তখন নির্ম্মম, সে

বলিল,—"কেন ? তোমার আমার ভালবাসা পাপ নয়, মনে প্রাণে তো আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে।' তরী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। জড়াইয়া জড়াইয়া বড় কষ্টে বলিল, "সমাজের মুখ দেখবে না, আমায় এমন দুঃখ লজ্জা দেবে ? ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ফিরে যাও

তার। (উচ্চৈস্বরে) সমাজ ! মানুষের গড়া শেকল, অবিচার অনাচার ! ভগবান তোমার জন্যে আমায় গড়েছেন, আমি যদি ব্রাহ্মণ হই, তুমিও তাই

তরী। সমাজের মুখের চূণ কালি নিজের মুখে মাখবে, তোমার পায়ে পড়ি, আমার মাথা হেঁট করো না, চির দিনটা মনে হবে—

তারক ধৈর্য্য[illegible] তরীর সে অশ্রুসিক্তা দশা আর দেখিতে পারিল না, কাছে গিয়া হাত ধরিল। তাড়িতস্পৃষ্টার মত তরী উঠিয়া দাঁড়াইল, মুহূর্ত্তেকে অশ্রু মুছিয়া বিবর্ণা অবলা ভিক্ষাকাতরা তরী কোমর বাঁধিয়া দৃপ্তা রণচণ্ডী হইয়া দাঁড়াইল, ঘৃণায় বিকৃত কণ্ঠে বলিল,—"ছিঃ। তুমি না পুরুষ ! দেহটা

কি এতই বড় ? এই তোমার ভালবাসা ? যার বড় সুখ আর কিছু নেই, মানুষকে যা' দিতে পার্‌লে মন ভরে উঠে, নিজের ক্ষতি বৃদ্ধির বোধ হারিয়ে যায়, যাও সেই বস্তু বাবার কাছে শিখে এস। যাও, এখান থেকে যাও গো যাও ; ওরা গাঁয়ে আমায় যা' বলেছে, তুমি আমায় তাই ভাব, নইলে এমনকরে কি নিতে আসতে পার্‌তে ?

ভাবন কশাহত পশুর মত পলাইল। তরীকে দগ্ধ করিতে না পারিয়া ব্যর্থ লালসার ক্রোধ তাহাকে ত্রিতাপের পথে টানিয়া লইয়া চলিল। সে ডুবিতে চলিল।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কুঁড়ে ঘরখানা পোস্তার ধারে। সামনে তরতরে গঙ্গা,- বাঙ্গালীর সেই সাগরসঙ্গমোন্মাদিনী হিন্দুর মনপ্রাণহরা ত্রিস্রোতা তারিণী গঙ্গা। আর কল হইতে একটু দূরে পথের ওপারে রাঙা খুড়োর হোগলার ঘর। রাঙা খুড়ো পাকা আমটী, যৌবনে তাহার মত দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা এ অঞ্চলে ছিল না, এখন খুড়া কেবল সিদ্ধিখোর। একদিন খুড়ার দৌরাত্ম্যে পোস্তায় মানুষ বিব্রত সশঙ্কিত ছিল, ত্রিসন্ধ্যা গোপনে ঘরে দ্বার দিয়া তাহাকে গালি না পাড়িয়া কেহ অন্ন জল গ্রহণ করিত না।

তাহার পর একদিন সাদাপাগড়ি পরা একজন পশ্চিমা লোক খুড়োর দাওয়ায় আসিয়া বসে। খুড়ো নাকি নেসার ঝোঁকে সে লোকটাকে লাঠি দিয়া মারিয়া পাট করিয়া শোয়াইয়া ফেলে। মারিতে মারিতে নেশা ছুটিয়া গিয়া নিরস্ত হইয়া খুড়া

দেখে লোকটি মৃদু মৃদু হাসিতেছে, তাহার শান্ত স্নিগ্ধ চক্ষু দুইটি ভরিয়া অপার প্রেম। লোকটি কাহার নাম করিতেছে খুড়ো তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া অসহায় শিশুর মত কাঁদিয়াছিল। সেই হইতে খুড়া এমনি ধারা নিতান্ত নিরাহ মূক হইয়া গিয়াছে।

সেই হইতে লোকে দেখিয়া আসিতেছে দাওয়ার যেখানে এই অচিন্ত্য কাণ্ড ঘটিয়াছিল, সেই খানে দিনের পর দিন খুড়া উপু হইয়া বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভুড় ভুড়, ভুড় ভুড় করিয়া তামাক টানে। যখন তামাক টানে না, তখন চুপচাপ একমনে বসিয়া মুখ নাড়ে, যেন ছাগলে চক্ষু মুদিয়া জাবর কাটিতেছে। খুড়া বড় স্বল্পভাষী, নিতান্ত দায়ে ঠেকিলে তবে এক কথায় মাত্র জবাব দেয়। ব্রাহ্মণ দেখিলে খুড়া প্রণাম করে না, রক্তচক্ষে মারমুখী হইয়া কটমট করিয়া চাহিয়া থাকে।

পাড়ার বামা আসিয়া নিত্য খুড়ার রান্নাঘর দাওয়া তুলসীতলা নিকাইয়া দু' সন্ধ্যা দু'টি রাঁধিয়া দিয়া যায়। বামা এ পাড়ার ছেলে বুড়া সকলের চিনি

মাসি ; বড় বদরাগী ও কুঁদুলে ; মুড়ো ঝাঁটা হাতে তাড়া করিয়া গেলে এমন জোয়ান পুরুষ বাচ্চা এ অঞ্চলে নাই যাহার মনে মনে দেগার ডিঙাইবার একটা অদম্য ইচ্ছা না হয়। কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন হয়, তাই বামার নাম চিনি মাসি।

বামা নাকি খুড়ার অতীত জীবনের অনেক কথাই জানে ; কিন্তু সে বড় চাপা মেয়ে, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে শণের নুড়ি চুল এলাইয়া হাত ঘুরাইয়া ছানাবড়ার মত চক্ষু পাকাইয়া মেছুনীর ভাষায় চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিয়া ছাড়ে। সকাল সন্ধ্যা একবার করিয়া আসরে না নামিলে বামার চলে না ; তাই সে সদাই কলহের ছুতা খুঁজিয়া ফেরে। আর কিছু না পাইলে রাস্তার মানুষ ডাকিয়া দাওয়া হইতে রণরঙ্গিণী বেশে আরম্ভ করিয়া দেয়, "ওরে, ও চোকখাকীর পুতরা ! তোদের কি মাগ ছেলে নেই, আমারি আস্তাকুড় দিয়ে জুতো-পরে ঐ গে খড়র মড়র করে যাবি আসবি, আর আমি মাগী বুড়ী হাবড়ী ছুটে ছুটে কে এল গেল তাই

দেখতে দোর খুলে দিতে আসবো। না—” ইত্যাদি। যাহার কপালে এ মধুসম্ভাষণ ঘটে, সে আড় চোখে চাহিতে চাহিতে সাড়য়া পড়ে, পালটা জবাব বড় একটা দেয় না। কারণ বামা প্রায় জগদ্বিদিত।

খুড়াও বড় একটা বাদ যান না। বামা রান্না করে, খুড়ার তামাক সাজে, সন্ধ্যা কালে তুলসী তলায় ও ঘরে সন্ধ্যা দেয়, আর কাজ কর্ম্ম না থাকিলে দু'দণ্ড দাঁড়াইয়া হাত মুখ নাড়িয়া মনের সুখে নিরীহ খুড়ার বিষ ঝাড়িয়া দিয়া যায়। সহিষ্ণুতার অবতার খুড়া নীরবে নির্ব্বিবাদে জড়ের মত বসিয়া সে অনর্গল আশীর্ব্বচন শোনে; বামা বড় বাড়াবাড়ি করিলে অগত্যা মরা ছাগলের মত চক্ষু ফিরাইয়া এমন চাহনীতে বামার দিকে চায়, যে বামা তাহা সহিতে না পারিয়া তড় তড় করিয়া পলাইয়া গিয়া বাঁচে। খুড়ার সহিত বামার কি যে ঝগড়া, পাড়ার লোকে তাহা বড় একটা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ঝগড়ার মধ্যে কেবল ঐ এক কথা,—“বল্‌ছি চ' বাপু, তিথি ধর্ম্ম করে আসবি, তাকেও একবার চোখের দেখা

দিতে আসবি, না এখানে দিবে নেই, বাতির নেই, উপ্ হয়ে বসে আছেন। এমন নোড়ে ভোলাও সাত জন্মে দেখিনি, যাড়ের নাদ গো, ষাঁড়ের নাদ, ন দেবায় ন ধর্ম্মায়।”

সে দিন কাকজোৎস্না রাত। নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে স্নিগ্ধ আলোর ঝিলি মিলি, জাহ্নবী চাঁদে চাঁদময়। ঘাট বাট ভরিয়া ফুটফুটে আলো, সুখশুক্লা নিশার হাসিতে বুঝি আজ বান ডাকিতেছে। বামা আঁচল বিছাইয়া রান্না ঘরের দাওয়ায় এত বড় হাঁ করিয়া ঘড় ঘড়, ঘড় ঘড় রবে নাক ডাকাইতেছিল; বাহিরের দাওয়ালে বাছা খুড়া যথাবিধি অচল অটল স্থাণবৎ বসিয়াছিল। তখন গভীর রাত্রি, সব নীরব বিজন, কেবল দূরে গঙ্গার বুকে কোন্ হিন্দুস্থানী মাঝি গান ধরিয়াছিল।

“বংশী চোরায়ে রাধা প্যারা
কোই দেখো লোগা বংশী চোরায়ে—
কোন্ বাঁশকে তেরো বঁশলী
কোন্ সখা চোরাই ?
বন্শী চোরায়ে মনহারা।”

কার বাঁশী চুরি গিয়াছে, তাই তার জীবনের গান আজ মুক; সেই খেদে তার এত ক্রন্দন। খুড়ারও অন্তর বাহির আজ কত কাল মুক, তারও বাঁশী যৌবনের প্রথম ফাল্গুনে চুরি গিয়াছে। খুড়া নিঃশব্দে উঠিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে সেই ঝুরিনামা বুড়া বট-গাছের ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইল। সেখানে একটা মিট মিটে আলোর সামনে বাবা বসিয়া গঞ্জিকার সেবা করিতেছিল, বাবার লোল চর্ম্মখানি কণ্ঠা ও গণ্ডের অস্থির উপর জিলজিল করিতেছে; মুখখানা রূপী বাঁদরের মত—হাসিলে দুই চক্ষুর কোণ হইতে ধনুকের মত কত রেখাই যে চোখের দুই কোণ অবধি জাগিয়া উঠে, সমস্ত মুখখানা রেখায় রেখায় ভাঙ্গিয়া গঙ্গার ঢেউকাঁপা বুকের মত দেখায়। খুড়া পায়ের ধূলা লইয়া বসিলে বাবা সহাস্যে বলিল,—"কেয়া বেটা বঁশলী মিলা ?" খুড়া হাসিল। খুড়ার এ হাসি এই বাবা ছাড়া আর কেহ দেখিতে পায় না। বাবা হিন্দিতে বলিতে লাগিল, "বাঁশী যার চুরি যায়, ওগো ছেলে, সেই বাঁশী বাজার

ভাল। দুঃখ হ'লো যমুনা তীর ওঁহা বসে নন্দদুলাল, তোমার বঁশলী পাওয়া গেছে।”

খুড়া মাথা নাড়িল। গৃহস্থবেশী এ অপূর্ব্ব সাধু তাহার চামচিকার ডানার মত অস্থি-চর্ম্মসার হাত দিয়া খুড়ার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল—“হাঁ হাঁ, বঁশলী মিল গিয়া,—দুখ যমুনা তট, ত্যাগ বৃন্দাবন, বাহিরে যে জন বনশী চুরি করেছিল, অন্তরে সে জন ফিরিয়ে দিয়েছে। যাও, এবার বাজবে ভাল।” চড় খাইয়া খুড়ার এক অদ্ভুত ভাবান্তর হইল; সে উঠিয়া টলিতে টলিতে নদীর ঘাটের দিকে চলিল। যেন্ কানা, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া পথ খুঁজিয়া যাইতে হয়; যেন মাতাল—পা এখানে পড়িতে ওখানে পড়ে। তখনও গায়ক নৌকার ছইএর উপর চিৎ হইয়া গাহিতেছে—

“লাল বরণকে চুড়িয়া শোভে
নীল বরণ্কে সাড়ী,
ওহি সখি বন্শী চোরাই।”

ঘাটে কে মেয়ে বসিয়া ছিল, উঠিয়া খুড়ার পায়ের

উপর উপুড় হইয়া পড়িল। খুড়া টলিতে টলিতে তাহার মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিল। পায়ের উপর তেমনি পড়িয়া থাকিয়া সেই মেয়ে বলিতে লাগিল,—“আমায় বড় কলঙ্ক দিয়ে গাঁয়ের লোকে ভিটে ছাড়িয়েছিল। তোমার তরী কি মন্দ হ'তে পারে? তোমায় ভালবাসতুম, তাই যে আমার মস্ত বক্ষাকবচ ছিল। আজ আমার বলতে লজ্জা নেই, আজ যে আমার সাব আকাঙ্খা অত ভালবাসা আমার সর্ব্বস্ব ধন তুমি অবধি কৃষ্ণে অর্পিত হয়ে গেছ। তুমি টাকা পাঠাতে, নবদ্বীপে বসে তাই খেতুম, আর সমাজ ও আত্মজন মিলে আমাকে যে দুঃসহ মিথ্যা কলঙ্ক দিয়েছিল, সেই রকম কলঙ্কে সত্যিকার দুখী মেয়ে যারা সেখানে আসতো, তাদের সেবা করতুম। আমায় দেখে আমার বুকের দানটা পেয়ে সবার পায়েঠেলা সেই দীন দুঃখী মেয়েগুলো শুধরে যেত; আমার কথায় কত জন যে ভাল হয়েছে, তার হিসেব কিতেব নেই। কিন্তু নিজে সুখ সোয়াস্তি পাই

নি; এক ভয় ছিলে তুমি—"বড় বাধ বাধ করিয়া অনেক কষ্টে তরী কথা শেষ করিল,—"তুমি আমার কলঙ্কের কথা বিশ্বাস করেছিলে।"

আজ তারকের সেই সব পুরাণ কথা—তুলসী বৈষ্ণবী ঘরের সেই নিষ্কাম সতীরূপ মনে পড়িতেছিল। সে, তরীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিল, "সে দোষ আমার, বুঝেছি, তরি, তুমি গুণে আমার অনেক বড়।"

তখন তরী মাথা তুলিল, তাহার সে অনিন্দ্য রূপ এত দুঃখেও তেমনি আছে; কেবল এক মাথা চুল একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। যেন সে কালো কুন্তল তরঙ্গে কে চূণ ঢালিয়া দিয়াছে। বিধবা তরীর বেশ সধবার, হাতে শাঁখা, মাথায় আরক্ত জ্বলজ্বলে সিন্দুররেখা। মাথা তুলিয়া সে হাসিল, বলিল,—"আমি যে তোমার বলেই তাই না তা' পেরেছিলুম তোমার বড় কি আমি হ'তে পারি। বাবা এখানে এয়েছেন? না?" খুড়া অঙ্গুলি দিয়া অদূরে বট গাছ দেখাইয়া দিল।

তরী সেই দিক উদ্দেশ করিয়া মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া বার বার প্রণাম করিল, বলিল,—"নবদ্বীপে আমার সব দুঃখ জ্বালার ভার তুলে নিয়ে সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়ে দিয়ে তোমাব কাছে এসে আছেন। অমন শিবের মত মানুষ কি আর হয়? আমরা কি ভাগ্যি কবেছিলুম বল দেখি যে এমন মানুষের সঙ্গ পেলুম?"

সে নিশা যে কোথা দিয়া কাটিল, সেইখানে তেমনি উপবিষ্ট দু'জনের একজনও বুঝিতে পারিল না। সকালে তরী যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে নবদ্বীপের উদ্দেশে চলিয়া গেল; যাইবার সময় পায়ের ধুলা লইয়া চক্ষের পাতাভরা অশ্রু চাপিয়া কাঁপা গলায় বলিয়া গেল ;—"আমায় না পেয়ে তবু তুমি সুখে ছিলে, কিন্তু পরে সমাজের হাতে আমার লাঞ্ছনার বাজ তোমার বুকে যে কি রকম বেজেছিল তা' আমার বুঝতে বাকি ছিল না। তাই যখন শুনলুম তুমি পোড়া বিধির উপর রেগে এমন সোণার বাটীতে কি ছাই পাঁশ গুলে খাচ্চ, তখন তোমায় দুষতে পারি

নি, কেরমাগত পড়ে পড়ে কেঁদেছি। বাবা আমার কান্না দেখে এলেন, তখন সাহস হ'লো বুঝতে পারলুম, এ হতভাগীর চোখের জলে তোমার পাপ ধুয়ে গেছে। মন আর দেহটা তোমার কাছে আসবার জন্যে কাঁদতো, কিন্তু কে যেন শক্ত করে চুলের মুঠি ধরেছিল,—আসতে দেয়নি, তখন এমন করে বুঝিনি যে, এ সাধ আশা কি অবধি মুছে ফেলে তোমায় কত বড় পাওয়ার মধ্যে পাব।"

খুড়া এক বুক ঝড় লইয়া তরীর মুখের পানে অতৃপ্ত নয়নে চহিয়া কাঠের মত বসিয়া রহিল। তরী বড় আনন্দে অবলীলাক্রমে নবদ্বীপের পথে চলিয়া গেল; তাহার মনে হইতেছিল, আর না দেখা হইলেও চলিবে; এ মিলন ভাঙ্গিবে না। বিধবা তরীর সীঁথার সিন্দুর তখন সতীর পুণ্যে জ্বল জ্বল করিতেছিল।

খুড়া বাড়ী ফিরিয়া সংসারের কাজে ব্যস্ত মামার কাছে আসিয়া থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার সে আনন্দমন্থর মূর্ত্তিখানা নিস্পন্দ ভাবে চাহিয়া

চাহিয়া দেখিয়া বামা হাতের ঝাঁটাগাছাটা ফেলিয়া দিল; খুড়ার কাছে আসিয়া কণ্ঠস্বরে অপার স্নেহ ঢালিয়া বলিল,—"আহা! এযেছেল ?" সে কথায় খুড়ার দুই চক্ষু বহিয়া ধারা নামিল। বামা সেইখানে মায়ের মত তাহার মাথা কোলে লইয়া বসিল; এত বড় কুঁদুলে মেয়ের কণ্ঠে চেষ্টা করিয়াও কথা বাহির  হইল না।

সঙ্গম তীর্থ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নবলক্ষ্মীকে আমার মত কেহ চিনিত না, আবার আমার জীবনের পথের পাশে অনাদরে আধফোটা সে মুকুলটি আমিই সবার অপেক্ষা দেখিয়াও দেখি নাই। ফুলের কুঁড়ি অমন তো কতই না দেখিয়াছি। ফুটিলে

ওর মধ্যে যে আবার ওরকম গন্ধ অত নয়নাভিরাম রূপ উছলিয়া উঠিবে তাহা কে জানিত? যে দিন সে সাড়া পাইলাম চির জীবনের মত বঞ্চিত হইয়াই পাইলাম। তখন সে ঊষায় তোলা জীবনটি পূজার সাজি হইতে গঙ্গাজলে চন্দন তুলসীতে ভরা নৈবেদ্যের ডালায় অঞ্জলি দেওয়া হইয়া গিয়াছে। বাকি আছে আমার মনভরা কান্না আর ভক্তিনত পূজা। যে দিন নব লক্ষ্মীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলাম "একি সেই লক্ষ্মী? রাতারাতি কোন্ সোণার কাঠির ছোঁয়ায় সেই কালো এমন ধারা আলোয় আলো হলো?" সে দিন হইতেই আমার জীবনের মোড় ফিরিল। কথাটা গোড়া হইতে বলি। আমার বাড়ী হালীসহর, চাকরীস্থান বর্ম্মায় মুলমীনে। শ্যামবর্ণ ছিপছিপে লতার মত লক্ষ্মী সেই কৈশোরে কবে যে আমার জীবনে আসিয়া আত্মীয় হইতে পরম আত্মীয় হইয়া ঢুকিয়াছিল তা' মনে নাই। সমাজ-সংস্কারক ঠাকুর! ভ্রূকুটি করিও না বাপু; বলিয়া ফেলি, আমাদের

হইয়াছিল বাল্যবিবাহ! বরাবর এক সঙ্গে ভাঁড়ার ঘরের শিকেয় তোলা আমচুর কাসন্দি চুরি করিয়া খাইয়াছি, রাগ হইলে গুম্ গুম্ করিয়া মেয়েটাকে ধরিয়া কিলাইয়া দিয়াছি, তার খিনচুনির জ্বালায় কালো পিঠভরা চুলের মুঠি ধরিয়া মর্ম্মান্তিক টানিয়া তাহাকে কাঁদাইয়াছি, এই তো মনে আছে। সে স্ত্রী আমি স্বামী এ ভাব অন্তরে ঢুকিতে অনেক দেরি হইয়াছিল, তার অনেক আগে আমি বর্ম্মায় পোষ্ট-মাষ্টারী পাইয়াছিলাম, লক্ষীকে চাকুরী স্থলে আনিবার বহু পূর্ব্বে একেবারে বকিয়া গিয়াছিলাম।

মা যখন আমাদের গাঁয়ের গুড়গুড়ে ভটচাযকে সঙ্গে দিয়া লক্ষ্মীকে বর্ম্মায় পাঠাইয়া দিলেন, তখন ঊনপঞ্চাশটি নেশা আমার উল্টো ট্যাঁকে গোঁজা, নাপোর বোন তায়া আমার ঘরের উপদেবতা। নবলক্ষ্মী সন্ধ্যার নির্ব্বাক ছায়ার মত কখন যে আসিল কখন যে আমার গাঁজার কল্কেটি হইতে সেই কটা উল্কিপরা পেত্নিটির দুর্ব্বাক্যগঞ্জনা অবধি সমস্ত ভার-টুকু মাথায় করিয়া কুড়াইয়া লইল, তাহা আমরা

কেহই টের পাইলাম না। শুধু দুইটি ভাব স্পষ্ট হইয়া আমাদের এতকালের পাতা উচ্ছৃঙ্খল সংসার ভরিয়া রহিল; একটা অন্তঃসলিলা চোরা ফল্গুর মত স্বস্তির ভাব, সেটা আমার মনে। আর একটা নিজের ঘরে হঠাৎ কোথা দিয়া কেমন করিয়া পর হইয়া পড়ার ভাব, তাহা আমার বর্ম্মী স্ত্রীব মনে। আগে আমি তাহার মন জোগাইয়া আড়ষ্ট হইয় চলিতাম, জুয়ার আড্ডায় আড্ডায় রঙ্গীন লুঙ্গীপরা চুলে রেশমী রুমাল বাঁধা বর্ম্মা ইয়ারদের সহিত নিঁশি ভোর করিতাম, আর "রোগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন" চাকুরী করিতাম। আমার বর্ম্মী গৃহিণী মোটা থপথপে দজ্জাল স্বাধীন জেনানা, স্বাধীন—কারণ সে বেতের আসবার তৈয়ারী করিয়া যা রোজগার করিত, তাহাতে আমায়ও পুষিত। আমার চাকুরীর সেই একশ' বিশ টাকা মাহিনা পাবার ঠিক পরদিনই জুয়ার আড্ডাগুলি দু'চার দান ছক্কা পাঞ্জায় গ্রাস করিত, শেষটা গাঁজার জন্য কি খোসামোদটাই না করিয়া যে তায়ার কাছে নাজেহাল হইতে হইত, তাহা

আমিই জানিতাম। নবলক্ষ্মী আসার পর হইতে দিব্য আরামে একশ' বিশ টাকা উড়াইয়া বাড়ী ফিরিয়া নেশা তো অযাচিতভাবে পাইতামই, উপরন্তু অনেক দিন পর সেই আম-কাঁঠাল কলার গাছে ঘেরা শান্ত সবুজ বাঙ্গলা দেশের চচ্চড়ি সড়সড়ি ভাজা মাছের ঝোল আর ভাতে মনের সুখে এ কামনাদগ্ধ —শ্রান্ত দেহটাও জুড়াইতাম।

নবলক্ষ্মী যে কেমন করিয়া আস্তে আস্তে তায়াকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া পাসে সরাইয়া দিয়া তাহার গেঁজেল লম্পট অপদার্থ স্বামীধনটির সহিত সমস্ত সংসারের ঝাঁট রান্না সেবাটুকু অবধি অধিকার করিয়া অটল ঘর-জোড়া গৃহিণী হইয়া বসিল, তাতা বর্ম্মী বেচারী বুঝিতে পারিল না। সে চেয়ার তৈয়ারি করিত আর দিবারাত্র চিল চেঁচাইয়া ঝগড়া করিত। কিন্তু নির্ব্বাক্ শান্ত কঠোর হইতেও কঠোর সেই সিন্দুরশোভনা বধূরূপটিকে এক চুলও নড়াইতে পারিত না। তবু তায়া যাইত না, কারণ সে বনের পশুর মত করিয়াই আমায় ভালবাসিয়াছিল।

তবু আমি নবলক্ষীর দিকে ফিরিয়া চাহি নাই। কে চায়? খোলা মাঠের ঠাণ্ডা কোল আর নিশ্বাস প্রশ্বাসের বাতাসটুকুর মত এমন করিয়া জন্মাবধি অক্লেশে কিছু পাইলে কে তার মর্ম্ম বোঝে? লক্ষীর সেবা না হইলে আমার চলে না তাহা বোধ হয় কিকাবে অচেতন রোগীর মত না বুঝিযাও তবু সে শুশ্রূষার প্রেমস্পর্শটি বুঝিতাম, কিন্তু তখন হাতীর দাঁতের চৌকো কালো কালো দাগওয়ালা জুয়ার দানার পড়তিই শয়নে স্বপনে জাগরণে চক্ষে দেখিতেছি, আর তাযার ব্যস্ত-ব্যাকুল টানাটানি বক্কাবকি হইতে প্রাণ বাঁচাইয়া চলিতেছি। লক্ষ্মী যে নরম দুধের মত শয্যায় আমায় শোয়াইয়া প্রত্যহ ভিন্ন শয্যার একটা তুচ্ছ মাদুরে মাটিতে শোয়, আর সকালে সন্ধ্যায় শুচি স্নাতা হইয়া তুলসীতলায় অতক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করে, তখন আমাকেও ছোঁয় না, তাহার তাৎপর্য্য বুঝিবার সময় আমার ছিল না। তাহাকে তো কখন আপন বলিয়া কণ্ঠহার করিয়া তুলিয়া লই নাই, সুতরাং

বঞ্চিত হইবার দুঃখ আমায় বিঁধিবে কি করিয়া? এখন মনে হয় লক্ষ্মী কিন্তু সেই আসন্ন কালরাত্রি টের পাইয়াছিল, নহিলে এমন পতিগতপ্রাণা এত সাধ্বী এ রকম শক্ত মেয়ে নিজের হাতে গাঁজার কল্কে সাজিয়া আমায় দেয়, জুয়া খেলিতে অমূল্য চরিত্রধন পাঁকে ফেলিতে একবারটি বারণ করে না! শেষে বুঝিলাম সে নীচের আদালত ছাড়িয়া দিয়া একবারে হাইকোর্টে তাহার নালিশ পেশ করিয়াছিল। তাই তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়াই এমন নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়াছিল।

সে দিন সন্ধ্যার সময় চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া বাড়ী আসিয়া আমি খপ করিয়া বাতিটা নিবাইয়া দিয়া দাঁড়াইলাম। লক্ষ্মী চৈতন্যভাগবতের পাতা হইতে মুখ তুলিয়া চাহিয়া রহিল, সন্ধ্যার বিগ্রহটি তেমনি আশার প্রতীক্ষায় ও ভয়ে স্তব্ধ। যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবে সহজ গলায় আমি বলিলাম, "ওগো, চট্‌ ক'রে খানকতক কাপড় আর টাকা কড়ি একটা পুঁটলিতে বেঁধে নাও তো।" লক্ষ্মী

ক্ষণেক থম্‌কিয়া রহিল, তাহার পর আমার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া উঠিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। আমি নড়িতে পারিলাম না, ভয়ে উৎকণ্ঠায় আড়ষ্ট উৎকর্ণ হইয়া ঠিক তেমনই বসিয়া রহিলাম।

তায়া পাড়ায় বেত কিনিতে বাহির হইয়াছিল, কিছুই টের পাইল না। লক্ষ্মী তুলসীতলায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পুঁটুলিটি হাতে আমার সঙ্গে চিরজীবনের মত সেই দিন পথে বাহির হইল। যদি বুঝিতাম সে আর ঠিক সংসারী হইয়া ফিরিবে না, তাহা হইলে জেলে যাইতাম, কিন্তু পলাইতাম না।

সে শ্যাম রাজ্যের সীমানার*১২ মাইল এ দিকে—তখনও ইংরেজ-রাজত্বের এলাকায়। চারিদিকে বন বন আর বন, আরাকানের জটাজুটের বিরাট বেড়ে ছায়াশ্যাম কাননভূমি। ঘন বনে বাঘ ভাল্লুকের রাজ্যে বাঙ্গালার মেয়ে এমন অকুতোভয় হয়, সে জ্ঞান আমার এই প্রথম হইল। পথ হাঁটিয়া হাঁটিয়া অর্দ্ধাহারে নেশার অভাবে কঙ্কালসার আমার তখন বিষম জ্বর। লক্ষ্মীর কোলে মাথা রাখিয়া পড়িয়া

আছি, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার অবধি ইচ্ছাটি নাই। এত দুঃখে এত পরিশ্রমেও ক্ষুধায়ও নবলক্ষ্মীর যৌবনশ্রীভরা কমনীয় দেহলতা ঠিক তেমনি সরস পেলব সুপুষ্ট সুশীতল, সে শ্যামবর্ণ এখন আরও উজ্জ্বলশ্যাম, আরও বিপদে পড়িলে এ মেয়ে দ্বিগুণ অভাবের মধ্যে বোধ হয় গৌরাঙ্গী পটে আঁকা বীণাপাণিটি হইয়া উঠিবে। দুঃখ এমন সুখদ কেমন করিয়া হয়?

দুই একবার, বন খস খস্ করিল, তাহার পর লক্ষ্মীর বাহু দুইটি আকুল আগ্রহে আমায় জড়াইয়া ধরিল। চাহিয়া দেখিলাম চারিদিকে লালপাগড়ী পুলিশ, একজন ইউরোপীয় ইন্সপেক্‌টর টুপি খুলিয়া রাঙ্গা মুখের ঘর্ম্ম মুছিতে মুছিতে সহাস্যে বলিতেছে, "ইউ সন্ অব্ এ বিচ্! হোয়াট্ ডেভিল্‌স্ ড্যানস্ ইউ হ্যাভ্ লেড্ আস্, ইউ নো?" লক্ষ্মীর মাথায় কাপড় নাই, সেই আয়ত অশ্রু-সজল ভাবউদাস চক্ষু দুইটি সাহেবের মুখে রাখা। সকলে মিলিয়া বোধ হয় লাথি ঘুঁসায় অস্থির করিয়া আমায় উঠাইয়া দাঁড়

করাইত, কেবল সাহেব হাত তুলিয়া তাহাদিগকে ঠেকাইয়া ডুলি আনিতে বলিল। আমায় থানায় লক্ষ্মী কোলে করিয়া লইয়া গেল, কি পুলিশে ধরিয়া লইল বুঝিতে পারিলাম না।

যে দিন জ্ঞান হইল, সে দিন দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড ঘরে লোহার খাটে নরম বিছানায় শুইয়া আছি, সারি সারি তেমনি খাটে আরও আশে পাশে কত রোগী। শুনিলাম এটা মুলগীনেব জেল হাঁস-পাতাল, লক্ষ্মী রোজ আসিয়া দুই দণ্ড আমার পায়ের কাছে বসিয়া যায়। তখনই সে আসিল, পায়ের ধূলা লইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার অঝোর অশ্রু ধারায় আমাব পা ভিজিয়া গেল, আমি বড় কষ্টে বলিলাম, "ওগো! আফিং আছে?" লক্ষ্মী এদিক ওদিক চাহিয়া খোঁপার মধ্য হইতে একটী কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া চলিয়া গেল। সে দিন আর সে দাঁড়াইতে পারিল না, থর থর করিয়া সে লাবণ্যে মাখা প্রেমশীতল দেহখানি তার কাঁপিতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমার নামে দুই হাজার টাকার সরকারী তহবিল তছরূপের মোকদ্দমা হইল। তিন মাস আদালত আর হাজত করিলাম, সেই সময় সব হারাইয়া আমি লক্ষ্মীকে পাইলাম। আগে হইতেই পাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আহা! এমন সম্পদের অধিকারী আবার জীবনে আর কিছু হয়? নবলক্ষ্মী আমার স্ত্রী, কিন্তু তখন সে নারীর অঙ্গে শুধু সেবার করুণাস্পর্শ ও নয়নে অনুপম সান্ত্বনার প্রেমস্নিগ্ধ চাহনী জাগিয়া রহিয়াছে। সে তাহার জগৎ ভুলান সম্মোহিনী শক্তিতে পুলিশ-প্রহরীদের "মাঈ" হইয়া বসিয়াছিল, নবলক্ষ্মীকে অদেয় তাহাদের কিছুই ছিল না; তাই সে আদালতে ও জেলে আমার সেবা প্রাণ ভরিয়া আশা মিটাইয়া করিতে পাইত। এই পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে পাপে ও নেশায় শীর্ণ দেহে অকালবৃদ্ধ আমি নবলক্ষ্মীর প্রেমে পড়িলাম; মরণাপন্ন

হইয়াও আফিং ছাড়িয়া দিলাম। সে আমাকে খাওয়াইত, বাতাস করিত, ধোযাইয়া আঁচলে দু'খানা পা মুছিয়া দিত, আর আমি সব ভুলিয়া তাহাকে দেখিতাম। খোঁপার মধ্য হইতে কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া নবলক্ষ্মী নিত্য সাধিত, আমি মাথা নাড়িয়া বলিতাম, "না"। সে হাসিয়া তাহা সুকৃষ্ণ কেশগুচ্ছে লুকাইয়া রাখিয়া দিত। আমার ভাবান্তর দেখিয়া সে এত দিন পর প্রফুল্লমুখে হাসিয়াছিল, হাসিলে তাহার বয়স বোধ হইত বার কি তের।

নবলক্ষ্মীর মুখ দেখিয়া আমি আত্মঅপরাধ স্বীকার করিলাম, আমার পক্ষের উকিল চটিয়া গেল, নবলক্ষ্মী অঞ্চলে চক্ষু মুছিল। সে আপন গহনা বেচিয়া আমার পক্ষে উকিল দিয়াছিল; এতদিন আমার আফিং ও আহার যোগাইয়াও এই নিত্য নিরাভরণার স্ত্রী-ধন অলঙ্কার কয়টি তখনও শেষ হয় নাই। অপরাধ স্বীকার করিলে সাজা হইবে, নবলক্ষ্মীকে পাইব না; এমন করিয়া পাইয়াও হারাইব। কিন্তু সে কমনীয় তেজে শান্ত, কত

নয়নবিমোহন অথচ কত কঠোর মাধুরী ছবি দেখিয়া মিথ্যা মুখে আসিল না, আজন্ম পাপের ব্যবসায়ী আমার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পবিত্র শুচি হইবার সাধ হইল।

আমার তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইল। বিচারপতি বলিলেন, অপরাধ স্বীকার না করিলে এ গুরুতর অপরাধে সাত বৎসর সাজা অধিক, হইত না। সাত বা তিন বৎসর তো দূরের কথা, সে অবস্থায় সাত দিন আমার জীবনলক্ষ্মীকে চক্ষের আড় করিলে আমার যে গুরুদণ্ড হয়, তাহার উপযোগী গুরুতর পাপ বুঝি ইহসংসারে নাই। সে কাঁদিল, দরবিগলিতধারে আ-কবরীকম্পিতা দশায় তবু হাসিয়া বিদায় লইল, আমায় সাহস দিবার জন্য তাহার এ হাসি! লক্ষ্মীর সীমন্তের ডগডগে সিন্দুর রেখা দেখিতে দেখিতে অন্ধ ঝটিকা বুকে রুধিয়া শুষ্ক রক্তচক্ষে আমি বিদায় লইলাম। জেলে গিয়া আছড়াইয়া লুটাইয়া পড়িলাম, ক্ষোভে ক্রোধে নিরাশায় পাগলের মত বিধাতাকে অজস্র অভিসম্পাত দিলাম। উঃ

বাসনার কি দাহ! এমনি করিয়া চাহিয়া এই রকম বঞ্চিত হওযাই বুঝি কুম্ভীপাক নরক।

(৬)

জেলে আর সব কয়েদী খাটে, খায়, কঠিন প্রাণ আরও কঠিন করিয়া পাপাচরণ করে, আর নরকে বসিয়া নির্লজ্জ হাসি হাসে। সে ব্যর্থতার অবনতি কি করুণ! মনের দুয়ার দিয়া সে কি মর্ম্মস্পর্শী আত্মঘাত!! সেখানে আমিই একা বিদ্রোহী। কাজ করি না, প্রায় খাই না, কেবল বেত, বেড়ি, হাতকড়ি, একান্তবাস, এমনি সাজার পর সাজা ভোগ করি, আব মানুষ দেখিলে অভিসম্পাত করি। জেলের দারগা সিপাহী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে লইয়া হারিয়া হাল ছাড়িয়া দিল, এত সাজা দিয়া আমার জেদ ভাঙ্গিতে না পারিয়া তাহারা আমাকে রেঙ্গুন জেলে বদলী করিল। সেখানে আসিয়াও আমার সেই ভাব; উপরন্তু আমি আবার আফিং ধরিলাম, যতদূর উঠিয়াছিলাম ততদূর পড়িলাম। আমায় বেত মারিলে আমি হাসিতাম, মাংস কাটিয়া রক্ত পড়িত, আর আমি

তারস্বরে 'এক' 'দুই' 'তিন' করিয়া গুণিতাম, কত বেত মারা হইল, জল্লাদের মারের সঙ্গে সঙ্গে বড় হাবিলদারের গুণিবার কথা, তাহার স্বর ডুবাইয়া দ্বিগুণ চীৎকার করিয়া আমিই গুণিতাম। হাতকড়িতে বাঁধিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিলে অশ্লীল কদর্য ভাষায় গালি পাড়িতাম। এইরূপে এক বৎসর কাটিল।

দ্বিতীয় বৎসরে আমি ঔদ্ধত্য ত্যাগ করিয়া মৌন নিলাম। মনের বিদ্রোহ নিস্তেজ হইয়া আসিল। হাওয়ার সহিত লড়াই কত দিন আর চলে? একদিন ডাকে নবলক্ষ্মীর পত্র পাইলাম। ছাপ বেঙ্গল পোষ্ট আফিসের। তবে সে এখানেই আছে। সে লিখিয়াছে, "আমি তোমার কাছে কাছেই আছি, তোমাকে এখানে এনেছে, আমিও এসেছি। তুমি ভাল হও, কাজ কর, তা হ'লে আমাদের দেখা হবে। তুমি সাজায় আছ, আমি তাই কোন উপায় করিতে পারি নে।" সেই দিন আমি আবার আফিং ছাড়িলাম, আবার নিত্য নিয়মিত খাইতে লাগিলাম। এক সপ্তাহ পর কাজ চাহিলাম, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

আমার সুমতি দেখিয়া এত খুসী হইলেন যে, পায়ের বেড়ি কাটিয়া একেবারে নিজের আপিসে রাইটারের কাজে আমাকে লইলেন। তাহার দুই মাস পর আবেদন করিয়া অনুমতি পাইয়া নবলক্ষ্মী আমার সহিত দেখা করিতে আসিল।—আমার স্বর্গের রুদ্ধ দুয়ার আবার খুলিয়া গেল। সে দিন কথা বেশী বলিতে পারিলাম না, শুধু আমার দুই চক্ষের এক আনন্দোৎসব গেল। সে দেখা ফুরায় না, ফিরাইবার ভয়ে বড় অস্থির করে।

এক বৎসর বিদ্রোহ, এক বৎসর মৌন, এমনি করিয়া দুই বৎসর গিয়া আমার সুখের দিন আসিল। আমার সাজার এই শেষ বৎসর। জানি না কেমন করিয়া বুঝি শুধু নবলক্ষ্মীকে অতৃপ্ত চক্ষে দেখিয়া দেখিয়া আমি সব চেয়ে বড় শিক্ষা শিখিলাম। বাসনায় বড় দুঃখ, শুধু একান্ত ভাবে মন প্রাণ দিয়া ভাল-বাসিয়াই সুখ, সে সুখের সিন্ধুকে প্রতিদানের বিন্দু এক রতিও বাড়াইতে পারে না। আমি মৌন সুখে মহা ধ্যানে বাকি এক বৎসর কাটাইয়া দিলাম।

শুনিলাম, নবলক্ষ্মী গহনা বেচিয়া রেঙ্গুনে দোকান দিয়াছে, একজন চীনা মেয়ে সে দোকানে বেচাকেনা করে; দু'জনে নাকি সই। নবলক্ষ্মী তুলসী মূলে বসিয়া ইষ্টনাম জপ করে, শুদ্ধাচারে তপস্বিনীর মত থাকে, আর দুই বেলা জেলে আমার সংবাদ নেয়। আমি যে দিন রেহাই পাইলাম, সে দিন নবলক্ষ্মীর সহিত দেখা না করিয়া রেঙ্গুন ত্যাগ করিলাম। যাইবার সময় পত্র লিখিয়া গেলাম, "আমি এ অশুদ্ধ দেহ লইয়া তোমার ঘরে উঠিব না— ও ঘর আমার তীর্থ। আমি তীর্থের বাসের পুণ্য সঞ্চয় করিতে চলিলাম। লক্ষ্মী, আমি এবার তোমায় পাইয়াছি, আর হারাইবার ভয় নাই। শুধু আশীর্বাদ করিও তোমার সাধ পূর্ণ করিয়া তোমারি মনের মানুষ হইতে পারি।"

তার পর যখন দু'জনে দেখা, সে দশ বৎসর পরে। জগন্নাথে সমুদ্রতীরে শ্রীচৈতন্য যেখানে নীলের পায়ে আপনাকে ডালি দিয়াছিলেন সেইখানে। আমি মনের সব বোঝা নামাইয়া তখন বড় আরামে

মুক্তির আনন্দে আছি, জগৎ আমার কাছে নবলক্ষ্মীর ছবি। হৃদয়ে অপরিমেয় প্রেম, মধুর মগ্নতা, আপ্ত-কাম শান্তি ও অপরাজেয় সুখ। এ সাধনা আমায় কে শিখাইল, কিছু না দিয়া এত দানে আমার বুক কে ভরিয়া নিল? বলিব?—নবলক্ষ্মী। বাবে জান?—তবে বলি শোন।

তখন আমরা পলাইয়া পলাইয়া ফিরিতেছি—শ্যামরাজ্যের পথে। অত দুঃখ আমি কখন পাই নাই, পাপের ব্যবসায়ী সুখের পতঙ্গ আমার দুঃখ সহিবার সামর্থ্য আদৌ ছিল না। দুঃখের কশাঘাতে আমার ক্ষণিক চৈতন্য হইয়াছিল। একটা গ্রামে আমরা দুই মাস ছিলাম; আমার ফুঙ্গীর (সন্ন্যাসী) বেশ দেখিয়া সকলে বড় ভক্তি করিত। একদিন হৃদয়বৃত্তির জ্বালা সহিতে না পারিয়া এক কুস্থানে গিয়াছিলাম। শেষ রাত্রে বাহির হইয়া দেখি দুয়ারে নবলক্ষ্মী, পাছে আমার কলঙ্ক হয় ভয়ে সে দুয়ার আগুলিয়া সারা রাত্র বসিয়া আছে। হঠাৎ মনে হইল গলিত শব কোলে বেহুলার কথা। আমি এত

বড় পামর, তার’পর নবলক্ষ্মীকে পদাঘাত করিয়াছিলাম। একদিন সে তুলসী প্রণাম করিতেছিল,আমার ডাক শুনিতে পায় নাই। আমি তাহাকে ও তাহার ইষ্টদেবতাকে লাথি মারিয়া সে দিন রাগের জ্বালা মিটাই। নবলক্ষ্মী আমার পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিল, “তুমি আমার দেবতা, তোমার ডাক শুনি নি, লাথি মেরে জ্ঞান দিয়েছ বেশ করেছ।” তুলসী গাছকে লাথি মারিয়াছিলাম সে জন্য সে বড় কান্না কাঁদিয়াছিল; তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সেই দিন জীবনে সেই প্রথম আমি তুলসী মূলে ঠাকুর প্রণাম করি। জেলে বসিয়া বসিয়া এই সব ভাবিয়া ভাবিয়া আমি যাহা শিখিবার শিখি, নবলক্ষ্মী নামে আমার স্ত্রী, কখন আমার সত্যকার স্ত্রী হয় নাই। কিন্তু সে আমার কে বল দেখি? এমন সুন্দর চূড়ান্ত অনুপম ভাষাব অধিক কিছু আর কাহারও আছে কি? এখন আমরা দু’জনেই সংসারী। কিন্তু এ সংসার বুঝাইবার নয়, আমরা এ উহাকে এক অনির্ব্বচনীয় অখণ্ডের মধ্যে পাইয়াছি। এ আমাদের ত্যাগ ভোগ মোক্ষ ও বন্ধনের সঙ্গমতীর্থ।

ও-পারের মেয়ে

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ছেলে বেলা থেকে আমি ঐ রকম। যেখানে বসে পড়তাম সেইখানে আমার সারা দুপুরটি কেটে সন্ধ্যা হয়ে আসতো, মাথার সূর্য্যি গাছের গোড়ায় রাঙা চোখে ঢুলে পড়তো, তবু আমার সাড় ভাঙতো না। মা বকতেন, বাবা পড়ার জন্য মেরে মেরে হাড় কালি করতেন, স্কুলে যমদূতের দোসর মাষ্টারের দল আমায় সোজা করবার আশায় কোন শাস্তিই বাকি রাখে নি। ঘরে ভয়, বাইরে ভয়, তাড়না লাঞ্ছনার অবধি নেই। তবু কি আমার এ রোগ গেল?

তোমরা সংসার কর, গণ্ডগোল কর, ছুটোছুটি হাসি কান্নায় কতই না সুখ পাও। আমিও তা কিছু কিছু পাই, আমিও তো রক্ত মাংসের মানুষ; আমারও তো মন-পাখী ডানা মেলে সুখের সন্ধানে উড়ে যায়, ভাব-সমুদ্দুর হৃদয়-আকাশে আশার ভানু

দেখে ফুলে ফেঁপে উথ্‌লে ওঠে, প্রাণ-যমুনা আকুল টানে উজান বয়। কিন্তু তোমাদের মত আমার একটা জগৎ নিয়েই তো কারবার নয়। একটা নিয়ে তোমরা উদ্বাস্ত, আমার যে কতগুলো ?

তবে শোন। শুনলে তোমরা বলবে, এ আমার কল্পনা, এ আমার পাগল-খেয়ালের দিবা স্বপ্ন। কিন্তু সজ্ঞানে জাগা-চোখে দিনের পর দিন যা দেখি, আমার অন্তর, সোপান দিয়ে নেমে এসে নিবিড় অন্তরঙ্গতায় যারা এমন করে আমার আপন যে মিথ্যে তা' বলি কি করে ? তোমার হয় তা'রা মায়ের আদর কি মিথ্যে ? তোমার বিয়ের দিনের সানাই রসনচৌকী লোক লস্কর কি মিথ্যে ? আমার খোকার মরা মুখ, তাই বুকে করে আমার আপিস করা, কি মিথ্যে ? তোমার কোলজোড়া মাণিক, তার আধ আধ বুলি, সে কি মিথ্যে ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমার সে জগৎও যে ঠিক এমনি সত্যিকার দেখা জিনিস, এর চেয়েও, যে উজ্জ্বল, প্রকট, সহজ, জাগ্রত। সে সৃষ্টি এলে এ সবুজ ঘাসপালা এ আকাশ বাতাস কেমন যেন ছায়া ছায়া হয়ে যায়, সুয্যির এত প্রখর আলো গ্রহণের মরা আলোর মত ম্যাড় ম্যাড় করে। সে জগৎ এলে এরই কোলে সেটা হয় সত্যি, এটা হয় স্বপ্ন; অথবা সেটা হয় এর কোমল তরল খাঁটি ভাবরূপ, এটা হয় তার মোটা স্থূল মলিন অসহজ বিকৃতি।

তবে গোড়া থেকে বলি। খোকা আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে প্রথম প্রথম শুধু আলসে আনমনে বসে থাকতাম, আমার কি জানি কেন শুধু শুধু চোখের পাতা জুড়ে ঘুম আসতো। সে কিন্তু এ রকম ঘুম নয়; এ ঘুম ভারী, সে যেন খুব হালকা; এ ঘুম অজ্ঞান, সে খুব সজ্ঞান; এ ঘুম অবসাদের; সে

ম নিছক সুখের; এ ঘুমে দৃষ্টি হয় আধভোলা ঝাপসা ভাঙা ভাঙা অবুঝের ঘোর, সে ঘুমে দৃষ্টি হয় জাগা দেখার চেয়েও হাজারগুণ সতেজ স্পষ্ট, নিখুঁৎ ও জ্ঞানময়।

এই সৃষ্টিজোড়া ঘুম যতই ঘুমাই ততই আমার মন বুদ্ধি দেহ প্রাণ যেন খুব একটা বিরাট ফাঁকার মাঝে ছাড়া পায়। সেকি সুখ, কি মুক্তি, কি বেপরোয়া সাঁতার; কোনও দিকে কূল নাই এমনতর জ্যোছনার মাঝে তরী খুলে পাল তুলে ভেসে পড়লে যেমনটি হয় এ যেন সেই রকম। এখানে যেন আনন্দ যাত্রার শ্রান্তি নেই, পাওয়ার শেষ নাই, এখানকার সাধ যেন তৃপ্তির কোলে খোকা, এখানকার মিলন যেন সোহাগের বুকের মাণিক।

একদিন আমার কপাল ফেটে একটা চোখ বেরুলো। সত্যিকার চোখ নয় কিন্তু তবুও একটা অপলক চাহনি অন্তরের নিবিড় থেকে আর কোথাকার নিবিড়ে যার পরিপূর্ণ দেখা, আনন্দের পরশে যার সাথে বস্তুর মর্ম্মভরা পরিচয়, কি এক একাত্ম

রসমাধুরীতে যা' দিয়ে. সব কিছু আস্বাদন করা। সেই চোখের কোল ভবে সেই থেকে দিন নেই রাত নেই আমার এই নতুন জগৎগুলি আসা যাওয়া করে।

সে জগতে শুধু আলো আর আলো, ছন্দ আর ছন্দ, রূপ আর রূপ। সেখানকার যা কিছু সব যেন নবনীর মত নরম, ঘন থলো থলো চাঁদের কিরণে গড়া, বড়ই পরশ নিবিড়। কোনো জগতে আবার যেন সবই সোনালী রোদের গড়া তবু কতই স্নিগ্ধ, কতই কোমল, কতই লাবণ্যময়। সেখানে যে সব রঙ খেলে যায় তার নাম মানুষের ভাষায় নেই, সে রঙের সবুজ নীল রক্ত পীত আভা মন্ত্রের শক্তি ধরে, স্পর্শে তাদের জীবনের ঢেউ কোথা হতে দুলে দুলে তোমার মাঝে উথলে আসে।

একদিন একটী মেয়ে এসে দাঁড়াল, সে সেই সোনালী কিরণের দেশের মানুষ। দেখে মনে হ'লো জগতের সব লাবণ্য তার মাঝে থৈ থৈ করছে, পরণের কাপড়ে পাটে পাটে তার বিদ্যুৎ ঘুমাচ্ছে, নড়তে

চড়তে তার অঙ্গ থেকে আমার সত্তার মাঝে ঝলকে ঝলকে রসের শিহর আসছে।

ঊর্দ্ধে অতি ঊর্দ্ধে কোন সত্যের কল্প লোকের এই ছবি আসে আসে ফিরে যায়। তার উদয়ে আমার মন প্রাণ চিত্তের কোনোখানে যখনি ঢেউ ওঠে, কামনা দোলে, ক্ষুধা জাগে, তখনি এ রসমধুর কল্পলোকের দুয়ার পড়ে যায়, আমার চোখে আবার এই মোটা দুনিয়া সত্যি হয়ে ওঠে।

চেয়ে না দেখলে এ মেয়ে মন প্রাণ সমস্ত জ্ঞান জুড়ে জেগে থাকে, নিখুঁৎ হতে নিখুঁৎ হয়, নিকট হতে নিকটে আসে। আবার ভাল করে দেখবার আঁকুপাঁকু এলে এ মেয়ে বিদ্যুৎ চমকে সরে যায়। এ বুঝি মৃণ্ময়া নারীর চিন্ময়ী ধাম, আমার পুরুষত্বের চরম শুদ্ধির গঙ্গা, পরম শান্তের বুঝি এ সার্থক অকাম পুতলা।

শিব যখন ধ্যানমগ্ন তখন এই বুঝি তার পার্ব্বতী; কাম যখন শিবকোপে ভস্মশেষ তখন এই বুঝি তাঁর রতি; নারায়ণ যখন শেষনাগের কোলে অনন্ত

শয্যায় চিরবিশ্রামে তখন এই বুঝি তাঁর বৈকুণ্ঠে-শ্বরী।

সে মেয়ে যখন সার্থক সফল স্বপ্নের মত আমার নয়নপথে ভেসে ওঠে তখন তার চোখের চাহনীতে স্ফুরে জগতের যত ভাষার অর্থ এ পর্য্যন্ত যে কেউ আদর করে যাকেও যা বলে গেছে সে যেন এক পলকে সে সবই আমায় বলে যায়। সে দাঁড়ায় এসে আমার যেন বুকের হৃদ্দলের মাঝে অন্তরতম হয়ে বিশ্বের সকল রকম মিলনকে মধুরতায় পরাজিত করে। সে কণ্ঠস্বরে সেই জগতের সোণালী আকাশ মুখর করে তোলে কত যে গীতের রাগিণী, কত যে যন্ত্রের সুর, কত বাতাসের সর সর, নদীর ছল ছল রহস্য।

কিন্তু এমন করে পেয়েও, তাকে আজও আমার পাওয়া হয় নি। এ জগতে এবং সে জগতে যতখানি ব্যবধান ও দূরত্ব, তার মাঝে আমার মাঝেও ততখানি দূরত্ব। এ জগত যখন দিব্য সুরে সুর বেঁধে সেই জগত হবে তখনই সে আমার হবে।

এখনও সে এলে আমি আর আমাতে থাকি নে, রিম ঝিম আনন্দের লহরে দুলতে দুলতে সে আসে নেমে আর আমি যাই উঠে। সে আমার মুক্তির দেবতা, মর্ত্ত্য ও বৈকুণ্ঠের মাঝের স্বর্ণসেতু, আমার ভগবানের রূপ নেবার ডাক। যখন উদয়াচলে ঢল ঢল কাঁচা সোণার নব-ভানুর মত এই শান্ত অকাম জগত আমার চেতনায় দুলে ওঠে তখন আমি যেন তার সাথে চড়া তারে সুর বেঁধে যাই। চার পাশে অনেক দিনের চেনা এই বাড়ী ঘর কেয়াবন পুকুরঘাট পোয়াল গাদা লাউ মাচা যেন তাদের প্রকৃতি বদলাতে বদলাতে ঐ অন্তর সুরে, সুর বেঁধে জমাট হয়ে আসে—সারা সংসার মনে হয় কি এক রসঘন একাত্মতায় অন্তরঙ্গ, সব কিছু হয় যেন ঐ অনুপমা মেয়ের হাতছানি, তার তনুসাগরের রসতরঙ্গ। ওপর থেকে গভীর গম্ভীর শান্ত বিপুল স্বরে বাণী ভেসে আসে, "তোমার মাঝে মলা মাটি সব যখন ধুয়ে যাবে তখন এই উর্দ্ধের সত্য নীচে এসে তোমারি পায়ের তলে দাঁড়াবে; তুমি হবে সে কল্যাণলোকের শিব, সে আনন্দধামের পুরুষোত্তম।"

জীবন নিয়ে খেলা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তার বিয়ে হয়েছিল কদমদীঘির জমিদার বাড়ীতে, তখন তাঁর বয়স পনর। সে আমার ছেলেবেলাকার 'গঙ্গাজল' পাতান সই, ঠিক খেলার সাথী তাকে বলা যায় না, কারণ সে বড় একটা খেল্‌ত না অথচ খেলার দলটি ভরে জমাট করে থাকতো, গল্প-গুজবে কথার নেশায় মেতে উঠতো না, অথচ তার ভরা চোখে চেয়ে থেকে বাতাসে দোলা সূর্য্যমুখীর মত মাথাটি নেড়ে নেড়ে নীরবে সায় দিয়ে গল্পের আসর জমিয়ে তুলতো। অমন মেয়ে আর আমি দেখি নি; সন্ধ্যার মত শ্যাম তার রঙ, তৃতীয়ার চাঁদের মত বাঁকা তার আয়ত চোখের শোভা, সন্ধ্যাসুন্দরীর মত মন্থর শীতল তার চরণগতি, তারায় ভরা শ্যাম নিশার মত সে মূক পরিপূর্ণ হিম। সহজ মেয়ের মত সে মোটেই নয়, তাকে নিয়ে কারু ঘরকন্না সালসার দোকান চলে না!

আমি ছিলুম তার ঠিক উল্টো। সহজ শক্ত ডাঁটো মেয়ে, যারা নিজে নোয় না, অথচ সবাইকে বশ করে, যারা জানতে দেয় না অথচ স্নেহে দিয়ে প্রেমে কোমল করে সবাইকে বাঁধে, বুদ্ধির ক্ষুর ধার জোরে যারা, পুরুষ অথচ সংসার জোড়া কোল নিয়ে নারী। আমি ছিলুম সেই রকম। আমি ছিলুম তার চার বছরের বড়, আমার বে হয়েছিল ঐ কলম দীঘিরই বড় তরফে, তার বিয়ের অনেক আগে। যখন বাইশ বছরেরটি সে প্রথম স্বামীঘর করতে এলো তার অনেক আগে আমার কপাল পুড়েছে, আমার শাশুড়ীই তখন বড় তরফ বলতে যা কিছু, আর আমি তাঁর মন্ত্রী, দাসী, সখী, বাহন, সবই। ম্যানেজার বাবু পরদার আড়ালে এসে দাঁড়ালেই বৌমার ডাক পড়তো, মহলে প্রজারা বিরোধী হ'লে আশাসোঁটাধারী পাইক ঘেরা বন্ধ পাল্কী আমার যে গাঁ দিয়ে যেতো সে গাঁ আপনি বশ হয়ে যেত। আমার গুণে শাশুড়ীর জমিদারীতে নায়েব গোমস্তারূপ বাঘ আর প্রজারূপ ছাগল একই ঘাটে জল খেতো। এমন শান্তির জমিদারী

ভুভাংতে দেখো নি, বাড়ীর ভেতর শাশুড়ীর রাজত্বটি যেমন ছিল দান ধ্যান যজ্ঞি মহোচ্ছবে ভরা আনন্দের হাট, জমিদারীও ছিল তেমনি রামরাজ্যি।

সচরাচর মেয়ের বাপ মা ভাবে বড় ঘরে বিয়ে হওয়া বুঝি মেয়ের বড় কপালের কথা। কিন্তু আমি জানি মেয়ের অদৃষ্টে সে কি গেরো, সে কি সর্ব্বনাশ! যে ঘরে লক্ষ্মীর-বাস সেই ঘরেই কি যত অপগুণ! "দারিদ্র্য দোষে শতগুণ নাশে"—তা সত্যি, কিন্তু আবার ধনেও মানুষকে কম জন্তু করে না। সে দর্প, সে অহঙ্কার, সে বিলাসের কাদা, সে পাপের বেহায়া প্রবৃত্তি তোমরা দেখ নি ; সরস্বতী ঠাকরুণ তো ধনার বাড়ীর দুয়োর কচিৎ কদাচিৎ মাড়ান। অবিশ্যি রাজা জমিদারের ঘরে গুণী জ্ঞানী কি আর নেই? এই দেখ না, স্বরূপগঞ্জের মাণিকবাবু, অমন শিবের মত মানুষ আর হয়? তাই বলি, বড় ঘরের লোভে মা বাপ মেয়ের সর্ব্বনাশই বেশি করেন, একচোখো বিধির এ পোড়া সংসারে টাকা জমিদারী বিয়ে কর, তা'লে স্বামী পাবে না ; আবার গরীব মধ্যবিত্তের ঘরে

স্বামীর সোহাগ আনন্দ পাবে,* টাকার মুখ দেখবে না। সব সুখ কি এক সাথে হয় গা? তাই যদি হবে তা'হলে মানুষ ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলে পুড়ে এত সাধের সংসার-ছেড়ে বিবাগী হবে কেন? বড় ঘরে মোহরের ঘড়াব সঙ্গে বিয়ে, স্বামীটী, হয় লম্পট—বাড়ীতে রাত্রিবাস করেন না, নয় গোমুখ্যু—উঠতে বসতে চোখ রাঙাণী আর লাথী; আর নয় তো লবাব খাঞ্জা খাঁ। দাসীর ওপর এক আধটুক্ নেকনজরই আছে, অত গরীবের ঘুঁটেকুড়ুনীর ঘরের মেয়ের ওপর ভালবাসা কি আর হয়? তার ওপর গুণের শাশুড়ী আছেন, ননদ আছেন, হয়তো সতীন আছেন।

তোমরা কি মেয়ের দুঃখ জান কেউ? ঐ ঘোমটায় ঘেরা নীরব সহিষ্ণু মানুষটির বুকের ওপর কত ঢেঁকির পাড় পড়ছে, কত যাঁতা পিষছে, তা কি ও-বেচারী কখন মুখ ফুটে বলে, না জগত শোনে; আর যখন বলে তখন একবারে কুলে কালী দিয়েই বলে যায়। সে কলঙ্কের আখর, তপ্ত

লোহার দাগ আর মোছে না, মেয়েটাও পথে দাঁড়িয়ে ঘরের দুঃখু হতে বাঁচে। আমার দুঃখের কথা এ পোড়া মুখে আর বলবো না, এইটুকু বললেই হবে যে আমার অদৃষ্টে আটবচ্ছর স্বামীঘর করার মধ্যে আটদিনও স্বামীমুখ দেখা ঘটে নি। আর সে কি দেখা! তার চেয়ে নারীর অতি বড় অপঘাতে মরণও ভাল। এই দুঃখে আমায় জীবনে আরও শক্ত করেছিল, আর বাঁচিয়েছিল স্নেহময়ী শাশুড়ীর কোল-জোড়া শরণ। মা আমার ছেলেকে হারিয়ে আমাকে বুকে নিয়ে সে দুঃখু ভুলেছিলেন। ছেলের সঙ্গে মায়ের মুখ দেখাদেখি ছিল না।

আমার বুকের পাষাণ বুকেই লুকানো থাক, লক্ষ্মীর কথা বলছিলাম তাই-ই বলি। নবলক্ষ্মী তার নাম, আমরা দু'জনে এক গাঁয়ের মেয়ে। বিয়ের সময়ে দেওয়া থোওয়া নিয়ে কি ছাই পাঁশ হয়েছিল বাপু, জানি নে; সেই তিল তাল হয়ে বেয়াইয়ে বেয়াইয়ে মুখ দেখা দেখি ছিল না। তিনি মলে তবে তারা বউকে ঘরে নিয়ে

এলো, তখন লক্ষ্মীর বয়েস বাইশ, কিন্তু দেখলে যেন তের বছরেরটি বলে মনে হ'তো। তখন আমি ওদের বাড়ীতে, মেয়েদের সঙ্গে উলুদিয়ে বউ আনতে গিয়ে দেখি, ওমা! এ যে ঘাটের মড়া! পাল্কিতে লক্ষ্মীর দেহ লুটিয়ে রয়েছে, রাঁশি রাশি কালো চুলের ঢেউয়ে সাদা ফ্যাঁকাসে মুখখানি ভাসছে যেন ম্লান আধঝরা শ্বেত পদ্মটী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তা'কে অমন অবস্থায় দেখে আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন তোলপাড় করে উঠলো। মুহূর্ত্তের জন্য কি যে দশা হ'লো, কি যে দেখলাম তা' ঠিক বলতে পারবোঁ না। মনটা আমার যেন স্তব্ধ গুমোট আকাশের মত মূক হয়ে গেল, কি একটা নঁতুন চোখ—খাঁটি দৃষ্টি ফুটে উঠলো। তাই দিয়ে অসাড় পাষাণ প্রতিমা নবলক্ষ্মীর যেন ছবিতে আঁকা মুখখানি, তার ক্ষুদ্র দুর্ব্বল অঙ্গযষ্টি, তার স্বচ্ছ

শ্যামরূপ দেখে দেখে দেখতে পেলাম এ মানুষ এ সংসারের নয়। একে নিয়ে একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে, একটা মোটা মলিন প্রবৃত্তির নিষ্ঠুর খেলা সুরু হচ্ছে, ফুটবার আগে পদ্মকলি কাদায় পড়েছে।

পাল্কী থেকে তাকে ধরাধরি করে বিছানায় তোলা হ'লো। বাড়ীর উলু শাঁখ উৎসব শ্রী হঠাৎ থেমে গেল, ঘাটের মড়া হয়ে নবলক্ষ্মী স্বামী-ঘর করতে এল। আমি খানিকক্ষণ থেকে তার জ্ঞান ফিরতে দেখে তবে সেদিন বাড়ী গেলাম। সেটা ভালই করেছিলাম, কারণ, এই নতুন অজানা অচেনা পুরীতে প্রথম চোখ মেলে সে আমায় দেখেই সাহস পেলো। ভয় পাওয়া হরিণের মত ডাগর ডাগর বিহ্বল চোখে আমায় দেখে তার আশ্বাস হলো, শুকনো পাণ্ডুর ঠোঁটে একটু ভাঙা করুণ হাসি জাগলো। তখন আবার বাড়ীতে বউ আসায় সে উৎসব শ্রী ফিরলো, আবার শুভ উলুধ্বনি উঠলো, আবার শাঁখ বাজলো। আমি কিন্তু মনমরা হয়ে কত কি ভাবতে ভাবতে বাড়ী ফিরলাম। আমার

মন যেন আজ এমনিতর অনেক দুঃখের সংসারের বিষবৃক্ষের গুপ্ত বীজগুলি দেখতে পেয়ে আঁৎকে উঠলো। এইতো সব জায়গায় হয়। ক'জন মেয়ে তার ঠিক জায়গাটি এ সংসারে পেয়ে সার্থক আনন্দে নিজের সত্যিটুকু ফোটাতে পারে? যে মা হতে এয়েছে, সে দাসী হয়ে মুসড়ে যায়, যে দেবী হতে এয়েছে, সে কামনার শয্যায় পাপের জোগান দিয়ে শ্রীহীন হয়ে কলায় কলায় চাঁদের মত ক্ষয়ে যায়, যে কাজে কর্ম্মে পদ্মিনী সত্যভামা হতে এয়েছে, সে এই সংসারের বেসাতি মাথায় করে এতটুকু হয়ে কুঁকড়ে থাকে; যে প্রেমের রস আস্বাদন করতে ভরা বুক, ভরা প্রাণ, ভরা চিত্ত নিয়ে জন্মেছে, সে পাপের বেসাতি নিয়ে পথের ধারে নারীত্ব বিক্রী করে করে আকণ্ঠ তার পিপাসা ঘোলা জলে জুড়োয়। এই তো আমাদের মেয়ের পাষাণ-চাপা জীবন, এই তো আমাদের সুখের সাজানো চিতা। তোমরা পুরুষ সবাই কি এক ধাতুর গড়া, সবাই কি এক পথে এক রঙে ফুটতে পার, তাতে কি তোমাদের

পুরুষত্বের শতমুখী গঙ্গা শুকিয়ে চড়া হয়ে যায় না? তবে মেয়ের বেলা এ অবিচার কেন?

তারপর যা' হ'লো সবটাই আমার চোখের উপর ঘটেছিল। আমার দেওর—নবলক্ষ্মীর স্বামী—সংসারের দিক দিয়ে মন্দ মানুষ নয়। জমিদার গুষ্ঠি। এই সংসারের পুরুষগুলো সবাই কেমনতর অবীনস্থ। কেউ মাতাল, কেউ চরিত্রহীন, কেউ গাঁজা-খোর গুণ্ডা। এই দেওরটি তবু ভাল, নাম তার তারা শঙ্কর, বয়স পঁয়ত্রিশ, স্বভাব চরিত্র বেশ নির্মল তবে এ পরিবারের একবগ্গা বাঁজালো ধাত যাবে কোথা? তারাশঙ্করেরও সে স্বভাব ছিল। সে আবার নীতির গোঁড়া, সবাইকে ভাল হবার জন্যে দিবানিশি তাড়া করে বেড়ানো ছিল তার কাজ। পাড়ায় আর পরিবারে সবাই তার জ্বালায় উদ্ব্যস্ত, মাতালের মদ খেয়ে সুখ নেই, ইয়ারের দলের মনের আরামে ইয়ার্কি আড্ডা দিয়ে সুখ নেই, আনুষ্ঠানিকের পূজো-আচ্চা করে সুখ নেই, ঘরের গিন্নি-বান্নি বউ ঝির ছেলে ঠেঙিয়ে, কোঁদল করে, পাড়া

বেড়িয়ে, পরচর্চ্চা করে, কোন রাতেই সুখ স্বস্তি নেই। তারাশঙ্কর সবাইকে 'ত্রাস' করে তাড়া করে আসছেই, দিন নেই রাত নেই কদমর্দাদের এই "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" গুরুমশাইটি মানুষকে ভাল করতে সদাই উদ্যত, নিজের ত শান্তি নেই আর পরকেও সে না ভাল করতে পারে,—না কিছু।

পাড়ার ছেলেরা তাকে দেখলে "কনস্টেবল আসছেরে" বলে যে যার গা ঢাকা দিত। বৌ-ঝিরা দুপুরবেলা দত্তদের পোড়া গোলাঘরে খিল দিয়ে তাস খেলতো। কচি কচি ছেলেগুলো তারার হাতে কান মলা চড়চাপড় খেয়ে কান্নকাটিতে আকাশ ফাটাত। চাকর বাকর ঝি দাসী আমলা গোমস্তা ভয়ে জড় সড় হয়ে তারারই মন জুগিয়ে মোসায়েবী করে কোন গতিকে দিন কাটাতো। এই রকম মানুষের হাতে পড়ে নীরবমুখ অমনতর আনমনা মেয়ে নবলক্ষ্মীর যে কি দশা হ'লো তা' আর কি বলবো। সবারাই বিরুদ্ধে তারাশঙ্করের যত নালিশ ছিল আমার কাছে, ঘরে বৌ আসবার

দিন সাতেক পরে একদিন দুপুর বেলা ঘরে বসে আছি, ঝড়ের মত তারা এসে ঘরে ঢুকে বলে উঠলো, "আচ্ছা বউদি, এটা কি বলতো ? মেয়ে, না জন্তু ?"

আ। কে ?

তা। বউ গো, বউ।

আ। কেন, কি হয়েচে ?

তা। হয়েচে আমার মাথা আর মুণ্ডু। বউ হবে সতী লক্ষ্মীটি, স্বামীর সেবা যত্ন করবে, সংসারে খাটবে খুটবে, শাশুড়ী ননদ আত্মজনের মন জুগিয়ে চলবে, ছেলে-পুলে গুড়ো গাঁড়াগুলোকে মা হয়ে খাওয়াবে নাওয়াবে, অবসর সময়ে একটু লেখাপড়া করবে। মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত ধর্ম্মগ্রন্থ একটু দেখবে—যাতে পরকালেরও একটু কাজ হয়। তা' নয়, এ যেন ঘর নিকোনো ন্যাতা, নড়ে না, চড়ে না, যেখানে রাখ সেইখানে পড়ে আছে। কেমন ভাসা ভাসা চায়, ভয় তরাসে আঁতকে উঠে, আমরা যে তার আপনার কেউ, তা' ওর ভাব গতিক দেখলে তো মনে হয় না।

আ। কি করবে ?

তা। ঐ তো বল্লুম। তুমি একবারটি গিয়ে দেখে এসো না। মা তো বেজায় রাগারাগি কচ্ছেন। মার তো ঐ দোষ, রাগ সামলাতে পারেন না, রাগ চণ্ডাল যে রিপু, বাড়ালেই আগুনের মত বেড়ে চলে তা' বোঝেন না। তুমি একবারটি চলো।

আ। আমি তো রোজই যাই, সবই তো দেখিচি। •বসন্ধ্যা যে আমার ছেলেবেলাকার গঙ্গা-জল। তা, বাপু, সব মানুষ তো কিছু সমান নয়, ওকে বিধি ঐ রকম করে গড়েচেন।

তা। তা' বল্লে চল্‌বে কেন, ঘরের বৌ ঝি, স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য রয়েছে ; ওকে কি বলে, বিবাহ— একটা কত বড় পবিত্র ধর্ম্ম, তার গতি মুক্তি ইহপর-কাল যে ওইখানে—

আ। না বাপু, তোমাদের শাস্ত্রে কি আছে জানিনে। ভগবান তো শাস্তর মেনে চলে না, মানুষই শাস্তর মেনে চলে।

জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হয়েই এদের আনন্দ। এরা ভরা অক্ষয় নিবিড় শান্ত কিছু বোঝে না, সাগর সঙ্গমে যেতে এদের তর্ সয় না, ধৈর্য্য বাঁধ মানে না। এ মেয়েকে নিয়ে এরা কি করবে বল তো? আমি লক্ষ্মীর মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলাম, "কি বোন, স্বামী ঘর ভাল লাগে না?"

ল। না।

আ। তবে কি ভাল লাগে?

ল। জানি নে।

আ। ওরা যে ঘরকন্না চায়।

ল। আমার ভাল লাগে না, আমায় ছেড়ে দেও, দিদি।

আ। সে মুচ্ছো রোগটা আর আসে?

ল। হ্যাঁ।

আ। কখন?

ল। রাত্তিরে।

আ। রোজ?

ল। রোজ।

আ। তুই যে ঘরের বউ, ওরা ছাড়বে কেন? ধর্ম্মে যে বলে তোকে তারার ঘর করতে হবে!

নবলক্ষ্মী আর কথা বল্‌লো না, কেমন যেন অবশ ভাবে শুয়ে রইল।

(৩)

তারাশঙ্কররা পশ্চিমে বেড়াতে গেছিল। তখন ফাল্গুণ মাস। শীতের পর সূর্য্যের আলোয় তেজ হয়েছে, ঝিম ঝিম দুপুর বেলায় সারা সংসারটা যেন অসাড়ে ঘুমুচ্ছে। আমার ঘরের রকে একটা পাটি বিছিয়ে চক্ষু মুদে অমনি আঁচলের ওপর আনমনে শুয়ে আছি। কখন চোখ লেগে এয়েচে জানি নে। দেখলাম সোণালী আকাশে নবলক্ষ্মীর মুখ, সে মুখে সুখ-তারার মত জ্বলজ্বলে অথচ মৌন স্থির হাসি। সেই শরীর কিন্তু তবু সে শরীর যেন নয়। সে শরীর যেন ছিল ভারী; এ শরীর যেন শরতের এক টুক্‌রো মেঘের মত হালকা; সে শরীর যেন ছিল মাটির রসে কাদায় ঠাসা, এ শরীর যেন ফাঁপা অথচ ভরা নিটোল কোমল। সে ছিল বাঁধা, এ যেন মুক্ত;

সে ছিল বড়ই অসহজ মলিন, এ যেন বড়ই সহজ শুচী। এখন বুঝলাম সে দিন কি দেখে টের পেয়েছিলাম সে এ জগতের নয়।

আমার মাথার ওপর দিয়ে এসে সারা অঙ্গটি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে হাসতে হাসতে সে চলে গেল। কে যেন ডেকে বললে 'ওর ছুটি হয়ে গেছে'। টপ্ করে সেই সোণালী আকাশের তলার দিকটা বদলে গেল, ওপরটা রইল সোণালী আর তলাটা হলো কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে ময়লা গুমোট ভারী। তার মধ্যে দেখলাম তারাশঙ্কর উপর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার চোখে রাগ, সারা দেহটা আড়ষ্ট, মুখখানা রক্তের আভায লাল। একটু দুরে দেখলাম তারার মা—আমার খুড় শাশুড়ীকে। সে যে কি দেখলাম তা' বলতে পারিনে। আমার খুড় শাশুড়ী বড় জঞ্জাল মেয়ে, তারাশঙ্করের আড়ালে অমন অসহায় মূক শান্ত বৌকে নির্দ্দয়ভাবে মারতেন। তবু যাহোক সে ছিল মানুষের—না হয় রাগী কুঁদুলী মানুষের চেহারা। কিন্তু এ দেখলাম কি? এই

কি তার ভেতরকার রূপ—কি কালো, কি রোগা, কি কদাকার ; চোখে একটা ঝাঁাজ, হাতে নড়ি।

জেগে উঠে বসে চোখ রগরাচ্ছি, ও-বাড়ীতে কান্নার রোল উঠলো। খসি ঝি ছুটে এসে বললে, "ওমা ওমা ! শুনেছ, পচ্চিমে বৌমা মারা গেছেন।"

আমি। কি হয়েছিল রে ?

ব। জানিনে, বাপু। রাত্তিরে ছোট বাবু ঘরে গেলেই মুচ্ছো যেতেন, সে ফিট ভাঙানো দায় হতো। এবার আর ফিট ভাঙেনি, ঐ ভাবেই চলে গেছে। আশ্চয্যি মেয়ে মা, ঠাকরুণের হাতে অমন মারটা খেয়েও মুখে কান্না ছিল না, মুখ দিয়ে রক্ত উঠতো কিন্তু জ্ঞান হরে যেতো না। অথচ সোয়ামী ঘরে গেলেই চক্ষু দু'টি কপালে উঠতো। বৌমাকে ভূতে পেয়েছিল, তা' রোজা ফোজা তো দেখালে না, স্তুধু মেরে পিটে বেচারীকে গঙ্গাজলী করে ছাড়লে।



পথের তিনটি হাতছানি

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি সকাল-সন্ধ্যা মণিকর্ণিকায় স্নান করতে যেতাম ; সঙ্গে যেতো জন্মহাবা ভূতো। ভূতোব বয়স বারো, বুদ্ধি বলে কোন পদার্থই তার ঘটে আদৌ নেই, তার উপর সে কালা। আমারও তখন বিশ বছর বযসে সবে কপাল পুড়েছে, মুখপোড়া বিধির দেওয়া অঙ্গভরা সে রূপ আমার চুল কেটে,থান পরে, হাতেব শাঁকা ভেঙে, সীঁথের সিঁদূব মুছে কিছুতেই ঢাকতে পাবি নি। পোড়াকপালে বিধাতাব সবাইকে নিযে রঙ্গ রসিকতা, আমাকে নিযেও তার খাম-খেয়ালীর অন্ত ছিল না !

আমি বামুনের ঘরের মেয়ে, তার ওপর গরীব। বাবা যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে যার হাতে আমায় তুলে দিয়ে চক্ষু মুদলেন, তার জরাজীর্ণ কঙ্কালসার দেহখানি ধরে শমনের পেয়াদা তখন ক্রোক বসিয়েছে। আমার

তিন বছরের জন্যে স্বামীর ঘর করতে আসা, না ঘাটের মড়া আগলাতে আসা! স্ত্রীলোকের পতি নাকি পরম গুরু,—কে জানে গুরু কেমন তা' তো জানিনে। বঠাদের বাড়ী তাঁদের কুলগুরু আসতেন,—কালো ষাঁড়ের মত চেহারা, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি, পায়ে এক হাঁটু ধূলো, লাঠির ডগায় হুঁকো আর একটা পুঁটুলি বাঁধা, কপালে গঙ্গামৃত্তিকা আর মুখে অনর্গল শ্লোক। সবার দেখাদেখি সাষ্টাঙ্গে আমিও পেন্নাম করতুম, কিন্তু মনে যদি একরত্তি ভক্তি হতো! হ্যাঁ গা, তোমাদের সোয়ামী কি সেই রকম গুরু?

হিন্দুর ঘরের মেয়ে, দুটি চক্ষু মুদেই সোয়ামীর ঘরে আসে। তার আগে একবার যখন ছানলা-তলায় ভয়ে তরাসে লজ্জা বিড়ম্বনায় চার চক্ষে মিলনের জন্যে চেয়ে দেখা তখন বিয়ে আর ফেরে না। কপাল-গুণে ভাল লোকের হাতে পড়লে তো দেবতা বল, গুরু বল, সবই সাজে, নইলে একটি আস্ত গরুর হাতে প'ড়ে হতভাগীর সারাটা জীবন জীয়ন্তে চিতেয় শয়ন।

সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার হয়েছিল ভাল; শাঁখ উলু বাদ্যি রোশনাই নিয়ে আমার যখন আনন্দের বাসর সাজলো, তখন সোয়ামীর কাশির সঙ্গে রক্ত উঠছে, কপালের শিরা দড়ার মত ফুলে উঠেছে। দেখে আমার সর্ব্বাঙ্গ হিম হয়ে এল। বুঝলাম, জাত-ধর্ম্ম বজায় রাখবার কত বড় দায়ে গরীব বাবা আমার মেয়ের সুখের ঘরে আপন হাতে এমন করে আগুন দিয়েছেন! অতটুকু বয়েসে সোয়ামী শ্বশুর-ঘর একটা ভয়ের অজানা অস্বোয়াস্তির জিনিস, পরে জীবনের নতুন মানুষটির আদর পেলে কি হয় জানি নে, আমার বাপু হয়েছিল "ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।" তাই যখন হাতের নোয়া এয়োতির চিহ্ন ঘুচে আমার সর্ব্বস্ব ফুরোলো, তখন পাড়া-শুদ্ধু কেঁদে হল্লাক হ'লো, কাঁদলুম না কেবল আমি।

কাঁদলুম না বটে, কিন্তু একটা মাস ভিটেয় এসে ঘরে দোর দিয়ে দিন রাত পড়ে রইলুম। শ্বশুর-গুষ্টি এমনতর অলুক্ষুণে রাক্ষুসী বউকে ঘরের কড়ি দিয়ে

বিদেয় করে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। এক মাস পাষাণের মত পড়ে পড়ে ভাবলুম, এ আমার হলো কি? কিই বা আমার লাভ হয়েছিল আর কিই বা আমার গেল। সোয়ামী মরায় আমার অন্তরে সিকির সিকিও ব্যথা লাগে নি, লেগেছিল যতখানি মর্ম্মান্তিক নিজের নিরাভরণ থান-পরা চুল-কাটা এই যাচ্ছেতাই চেহারা দেখে। কালো যমুনার ফুলে ফুলে ওঠা ঢেউয়ের মত একরাশ চুল আমার সমস্ত পিঠ ঢেকে হাঁটুর নীচে লুটিয়ে পড়তো। আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বুকের একখানা পাঁজর দিতে পারতুম, তবু চুল দিতে পারতুম না। তারপর চাঁপার অঙ্গে সেই পাতলা চেন-হারটুকু আর পদ্মের ডাঁটার মত সুডোল হাতে সোনার চুড়ি ক'টি ছিল আমার প্রাণ। যাক্ গে সে সব ছাইপাঁশ দুঃখের কথা। যা' বলছিলুম, তাই বলি।

সে দিন কার্ত্তিক পূজো, শীতের বেশ একটু আমেজ দিয়েছে। আজ তিন দিন হলো, আমি আমার ভাবনার অনন্ত-শয্যা ছেড়ে উঠেছি। রোজই

গঙ্গাস্নানে যাই, সন্ধ্যা আর উষার আঁধার আঁচল-খানিতে এ পোড়া রূপ গলিব মুখে এসে মুখ তুলে দেখি, আঁধার দুয়োরে সেজেগুজে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। এ হতভাগীদের রোজই ঐ পাপের পসরা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, আজ যাকে দেখলাম সে বড় রূপসী। আঁকা ভ্রূ-দু'টির তলায় কালো কালো বড় বড় চোখ,—সে অতল-নিবিড় কালো বড় টানে, জগৎ-সংসারকে মজায়, জ্বালায়, সর্ব্বনাশ করে ছেড়ে দেয়। মেয়েটার শরীরেও সেইরূপ, রূপ তো নয় আগুন, যেন শীতল কোমল হয়ে মূর্ত্তিমান আগুনের হল্‌কা দাঁড়িয়ে আছে! তাকে দেখে মন আমায় ডেকে বললে, "এই একটা পথ, যাবি?" পথ বটে, কিসের? সুখের, না মরণের, না জীবন-চিতার? পথে বেরুলে, হিঁদু মেয়ের রোজগারের পথ দু'টোই বটে—দেহ বেচা আর দাসীবৃত্তি!

যা আমি চাই নে, যে আত্মঘাত এমন করে ভয় করি, তাও যেন কেমনতর টানে! আমার ভেতরের

দেবতা যাকে দূরে ঠেলে, পশু তারই দিকে লোভের চাউনিতে চায়। নরকের উত্তেজনাতেও তার অসাধ নেই, হোক ভয় আঁধার অজানার বাঁকা গলি তবু তো নতুন। আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না। কাছেই ঘাট, নামতে গিয়ে দেখি, পাশে জলের ধারে খুব ভিড় হয়েছে। মনটা কেমন যেন ঐদিকে টানতে লাগলো, আমার আর নাওয়া হলো না। এগিয়ে গিয়ে ভিড়ে গলা বাড়িয়ে আমি শিউরে উঠলুম। এ কি? এ কার শব? যাকে এখনি দাসু ময়রার গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌তে দেখলাম, এ যে তারই মুখ! সেই তুলির আঁকা সরু সুরেখা ভ্রূ, সেই বড় বড় চোখ, তার ঘন রোমের কালো পাতা, সেই আম-দিগলো মুখ, জোড়া ধনুর মত বাঁকানো ঠোঁট দু'টি। আমি ভিড় ঠেলে হুড়মুড় করে এগিয়ে গিয়ে তার মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসলুম। কারা যেন বলে উঠ্‌লো, ছুঁয়ো না বাছা ছুঁয়ো না, অপঘাতের মড়া।" আরও কত লোকে কত কি বললো। ভিড়ের অত গণ্ডগোল আমার যেন খুব দূরে-শোনা হাটের রোলের মত

কানে আসতে লাগলো। নুয়ে পড়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে দেখি, না সে নয় বটে ; তেমনি মুখ, সে শুধু জীয়ন্তে মরা, আর এ সত্যিকার মরা ! আহা কি দুঃখের বোঝা না জানি নামিয়ে বোন আমার বেঁচে গেছে। কালো একরাশ ভিজে চুলে কাদা আর জল গড়িয়ে পড়ছে, মুদিত চোখ ভরে যেন স্বস্তির ঘুম, সর্ব্বাঙ্গে ভিজে কাপড় জড়িয়ে জড়িয়ে সে রূপ ঢেকে-ঢেকে তবু খুলে-খুলে দেখাচ্ছে, হাত পায়ের আঙ্গুল জলে হেজে গেছে। কে যেন আমায় ঠেলে তুলে দিল, লোকে বললে, "পুলিশ এসেছে।" আমি চোখে কিছু দেখিনি, কিছুক্ষণ চোখের দৃষ্টি যেন কোথায় চলে গেছল।

সে ঘাটে আমার নাওয়া হলো না। পাশের ঘাটে অনেকক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে তারপর আস্তে আস্তে জলে নামলুম। ডুব দিতে যাব, পাশে বড় স্নেহমাখা মিষ্টি স্বরে কে বললে, "হ্যাঁ গা বাছা, তুমি ত ডুব দিচ্ছ, আমার ঠাকুরটি খুঁজে দেবে ?" চোখ তুলে দেখি একজন আধা-বয়েসী মেয়ে, কপালে

শ্বেতচন্দন, চুল এলোনো—যেন জীবন্ত সরস্বতীর প্রতিমাখানি। হাতে একটি ফুল-চন্দন-সিন্দুর মাখা পিতলের সিংহাসন,চোখ দু'টি জলের দিকে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনার ঠাকুর কোথা ?"

মেয়েটি বললে, "ঐখেনে জলে পড়ে গেছে, গোকুলনাথ বাল-গোপালের রূপ, কাল পাথরের বিগ্রহ। চান করাতে এনেছিনু বাছা, পা পিছলে ামলাতে গিয়ে পড়ে গেছে।"

আমি অনেক ডুব দিলুম, সারা ঘাটটা হাতড়ালুম, শেষে হাঁপিয়ে গিয়ে ঘাটের চাতালে উঠে দেখি সে মেয়েটি দিব্যি শান্তশিষ্ট হয়ে কেমন যেন আনমনে বসে আছে। তার পাশে মাটিতে ঠাকুরের শূন্য সিংহাসনটি পড়ে আছে। আমায় দেখে তার শান্ত উদাস চোখ তুলে সে বললে,"থাক্ বাছা তুমি আর খুঁজো না। ঠাকুর আমায় মুক্তি দিয়ে গেছেন,ভিতরের পূজোয় সব ভরপুর, বাইরের পূজো আর পেরে উঠছিলুম না, বড় ভার বোধ হচ্ছিল, তাই বাইরের ঠাকুর সরে গেলেন।" আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে

সেই উজ্জ্বল স্নিগ্ধ মানুষটিকে দেখছি—তাই তো, এ আবার কেমন মেয়ে! সে হঠাৎ চোখ তুলে বললে 'থাক গে, তুমি পথ পেলে, বাছা? তোমার যে সময় হয়েছে, পথ খুঁজে নাও, বেলা পড়ে এলো, আর চোখে দেখতে পাবে না; এই ভরা হাটে পারের বেচা কেনা করে নাও।"



বাজার খরচের খাতা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একটা ময়লা হলদে তুলোট কাগজের মলাট দেওয়া নিজের হাতে সূতোয় সেলাই করা পৃষ্ঠা ত্রিশেকের খাতা। খাতার সমাজে এখানা নিতান্তই শ্রমজীবী জাতীয় জীব, একবারেই আটপৌরে ব্যাপার, না, ছিল তার রংচঙে মলাট, না ছিল মরক্কো কি হাফ-লেদার বাইণ্ডিং, না ছিল পেটভরা ধপধপে মোটা এণ্টিক বা আইভরী ফিনিশ কাগজ। সেটা পড়ে থাকতো কখন বালিশের তলায়, কখনও চুরুটের ছাইয়ের সঙ্গে মেজের ওপর সহমরণে, কিম্বা কখনও একহাঁটু ধূলো ভরা আরসুলার রাজ্য ঐ তক্তপোষের অন্ধকার তলাটায়। তার প্রথম পাতায় যদিও লেখা ছিল রাইচরণ সরকার, মেডিকাল কলেজ, ফার্ষ্ট ইয়ার; তবু রাইয়ের সঙ্গে এ হেন খাতাটির দেখা সাক্ষাৎ মুলাকাৎ হোতো খুব কমই। কারণ

মালিকের খামখেয়ালী যত্ন আর ঘন ঘন উপেক্ষার ব্যথায় সে প্রায়ই হারিয়ে যেত, মনের দুঃখে নিজেকে ভুলে মিশে থাকতো কখনও একরাশ উইয়ে খাওয়া বিজলীর গাদায়, কখনও বা ঝিয়ের ঝাঁটার মুখে জড়ো-করা ছেঁড়া কাগজের পাড়ায় আর কখনো বা ধোপার বাড়ী যাবার জন্যে গাদা-করা ঘামের গন্ধে আকুল করা ময়লা জামা-গুলোর একটার ছেঁড়া পকেটে।

রাইয়ের পরিচয় কিন্তু আমরা যেটুকু জানি তা' ওর নিতান্তই অযত্নের ঐ সাথীটির পাতা ক'টি উল্টে। সে ঘটনাগুলো ছাড়া ছাড়া অসংলগ্ন ইঙ্গিতমাত্র হলেও তার বেশী ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না; রাইকে বুঝতে হলে তার জীবনের ইতিহাসের এই ছেঁড়া টুকরোগুলো একত্র করেই কোন গতিকে বুঝতে হয়। এই দেখনা, খাতার দ্বিতীয় পাতায় লেখা আছে—

১৩ই ফাল্গুন, ২৭—সিল্কের মোজা ৫৷৶৫
হনি ক্রিম সাবান ৷৷৹

বড় দোকানের হাওলাৎ

শোধ	৫১৶১০
চানাচুর	/৫
গোলাপী লেউড়ি	৻১০
পেরেক	/০
জুতো সেলাই	৶০
বদন ময়রা	২৷/০
ডোরিটা সিগার	১৫৲
কাঁচি সিগারেট	৶০

এইভাবে পরে পরে দশখানা পাতা উল্টে গেলে প্রায় তিন মাসের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়; অবশ্য তারিখগুলো সব এলোমেলো। ১৩ই ফাল্গুণের খোস পোষাকী হিসেবটার পরই ২৩শে চৈত্রের ধোপার হিসাব, আর তার পর ঐ রকম এক এক লাফে দু' তিন হপ্তা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে কখন বাজার খরচ আর কখনও ধোপার হিসেবের ভিড়। প্রথম দুটো হিসেবের পরই বাকি সবগুলোই আরম্ভ হয়েছে জরিমানার অঙ্ক দিয়ে, সে জরিমানার হার ২৲ টাকা থেকে চার আনা অবধি—সবগুলোই হোস্টেল

পালানোর ফাইন। এই অপরিজ্ঞাত কুলশীল রাই চরণের হিসাবগুলির মধ্যে একটা শোকাবহ ট্র্যাজেডির সুর ক্রমে ঘনিয়ে এসেছে, তা' বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। অবশ্য হিসাবে জমার অঙ্ক কোথায়ও নেই, শুধু পরের রোজগারের সহজলভ্য টাকাগুলোর সদ্গতির একটা যথাসম্ভব সঠিক নিকাশের চেষ্টা বাইযের ভোঁতা কলমের মুখে অবিশ্রাম হযে চলেছে। দু'চারটে তারিখ ডিঙিযে গিয়ে দেখা যায় খরচের বেস্ত ঠিক পূর্ব্বের মত জুটে উঠছে না, হনিক্রিম সাবান দেশী টার্কিশ বাথে দাঁড়িয়েছে, সিল্কের মোজা ও রুমাল দাঁড়িযেছে খুব সম্ভব ভদ্দর গোছের খদ্দরী রুমালে, বদন ময়রার কপাল পুড়ে চ্যানাচুর ও গোলাপী লেউড়ী ভয়াবহ বেগে বেড়ে চলেছে, ডোরিটা হাভানা গিযে পৌঁচেছে সস্তা মাদ্রাজী জমাদার ও হাওয়াগাড়ীতে।

"কভি ঘৃত ঘনা
কভি মুঠিভর চানা
কভি ওভি মানা"

রাইয়ের হিসাবের অবস্থা হয়েছে তাই। বিপদ কখন একা আসে না। রাইয়েরও জীবন-অভিসারের কুঞ্জপথ কালো আঁধার বাদল তুফানে ঘিরে কালো করে আসছে তা পরের পাতাগুলিতেই দেদীপ্যমান।

"৫ই বৈশাখ—চিপীটক	৵০
দধি	৵০
কদলী	⁄৫
শর্করা	।০
গোলাপী বিড়ি	৶১০
জুতো সেলাই	৶১৫
ফাইন	১৲

"শ্রীমতী সিন্ধুবালা দেবী। সিন্ধু—সিন্ধু, রাইয়ের ডুবে মরার সিন্ধু।—

"মনের বাসনা শ্যামা
শবাসনা শোন্ মা বলি—"

"২১ বৈশাখ—ট্রাম	।৵০
জান বাজার ট্রাম	৶০
জরিমানা	২৲
চিপীটক	⁄০

রাবড়ি	।১০
গোলাপী বিড়ি	৫
চা	।০

"অলিন্দ কূলে
বসেছিল সে,
আপন মনে
হেসেছিল সে —"

"রাইচরণ। সিন্ধু—৫।১এ, মালিনীপাড়া লেন"

পাঞ্জাবী	২
সিল্কের কোট (ছেঁড়া	১
ধুতি (কালোপেড়ে)	১
ঐ (কোকিল পেড়ে)	১
রুমাল	৬

এই অনুপাতে আর দশ পাতা ব্যাপী তিন মাসের সর্ব্বনাশের হিসাব নিকাশ। ক্রমশঃই রাইয়ের কপর্দ্দকহীনতার সঙ্গে সঙ্গে চক্রবৃদ্ধিহারে কবিতার মাত্রা বেড়ে চলেছে। ভদ্র সন্তান কি শুধু চিঁড়ে খেয়ে দিন কাটাতো আর হোষ্টেল পালিয়ে ট্রামের ভাড়া জুগিয়ে সিন্ধুর সেই কুলমাননাশা অলিন্দ মূলে

ঘুরে ঘুরে বেড়াত? কে জানে? প্রেমে পড়া বিরহীর গতি "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

তখন গ্রীষ্ম গিয়ে "আষাঢস্য প্রথম দিবসে" বিশ্ব প্রকৃতি হরিৎ সজল-সিক্ত হয়ে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে খাতা খানিরও হিসাবের অঙ্কের ক্ষীণ-স্রোত এক রকম শুকিয়ে গিয়ে গদ্যে পদ্যে তপ্ত বিরহ-শ্বাসই কেবল বইছে।

"কিরণে করিয়া স্নান নেমে আসে রূপসী!"
এত কি সহিতে পারে আঁখি দু'টি উপসী?"

শ্রীযুক্ত রাইচরণ সরকার—শ্রীমতী সিন্ধুবালা দেবী।
"দেবী না দানবী।"

"৩রা আষাঢ়—ভাজা চিপীটক	৴১০
চানাচুর	৴১০
গোলাপী লেউড়ী	৵৫
ফাইন	২৲
জানবাজার ট্রাম	৶৹

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুণে পুড়িয়া গেল,
অমিয়া সাগরে সিনান করিতে

সকলি গরল ভেল—"

হা বিধি কি মোর কপালে লেখি

সখিরে কি মোর করমে ভেলি—"

* * *

"৭ই আষাঢ়—নূতন দুধে গরদ সাড়ী	২৭৲
পার্ল পাউডার	।৶০
চিরুণী	৩।৶১০
ব্লাউস	৫৴০
কুন্তল মালতী	১॥০
গোলাপী লেউড়ী	৴০
চানাচুর	৴৫
বিড়ি	৲১০

"নীরবে আমার হাতখানি শুধু টানিয়া

আমারে পাগল করিলে—

বিরহ আমার হরিলে !"

Oh ! the joy of it, She here !

"আমিত কিছু চাইনে, শুধু বিলিয়ে দেব, মিলিয়ে দেব, হারিয়ে যাব—"

খাতা খানি এই ভাবে সারা বর্ষা বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে কেঁদে হঠাৎ মিলনের সুখে হেসে হেসে তারপর

দুইমাস নীরব হলো। একেবারে হেমন্তের মাঝে হঠাৎ আর একটা হিসাব পাওয়া গেল গয়ায়! গয়া!! কলকেতা কোথা গেল! জানবাজারের ট্রাম, ফাইন, ৫।১এ, মানিনী পাড়া লেন, সব হঠাৎ আরব্য উপন্যাসের মায়ার মত উপে গিয়ে হঠাৎ এ কি—

"২১ কার্ত্তিক—চামেলী পানওয়ালার দোকান

বড়চৌক গয়া—

কুলি	‍/১০
এক্কা ভাড়া	৸/০
হোটেল	।৶০
পান	৴১০
গোলাপী বিড়ি	৴১০
ছাতু	‍/০
দধি	‍/০
শর্করা	‍/০

"সানাই! উহু, কি সর্ব্বনাশা আওয়াজ! কাল-ভুজঙ্গিনীর ফুৎকার, মায়া রাক্ষসীর ক্রন্দন—হা ভগবান! তোমার মনে এই ছিল?"

"৩০শে কার্ত্তিক—আর কত দুঃখ দিবি, মা

হররমা?

ফুরায়েছে ভবের খেলা
দেখা দে মা এই বেলা
এখনও না এলে শিবে
পরে কি আসিবি মা ?"

* * * *

"১৭ পৌষ—কেন আর মিছে মায়া
কাঞ্চন কায়া ত রবে না।
—"আর আমি যে পারি নে"

এই খাতাখানি কুডিহে পাবাব সাত বছব পবে আমি পশ্চিমে বেডাতে গিযে এলাহাবাদে এক গলিব মাঝে একটা বাডীব ফটকেব গাযে শ্বেত-পাথরে লেখা দেখলাম—

"Rai Charan Sarkar
Honey Lodge."

বাইচরণ সরকার, হনি লজ! এ আবার কি? বড় কৌতুহল হ'লো, বাড়ীতে ঢুকে ড্রয়িং রুমে একজন স্থূলকায সাহেবী ধাঁজের মানুষকে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, "মশাই, রাইচরণ বাবু এখানে থাকেন?"

মনে হ'লো, এত বড় মূর্ত্তিমান মাংসল ভুঁড়েল গন্ধ কি আর এত সাধের খাতাখানার রাই হবে!"

ভদ্রলোক। আজ্ঞে, আমিই রাইচরণ।

আ। মাপ করবেন, বিশেষ কারণেই জিজ্ঞেস করছি। আপনার—এই ওর নাম কি, মিসেস্ রায়—

ভদ্র। হ্যাঁ, লতিকার কথা বলছেন? কি—কি? তাকে ডাকবো নাকি, আপনি কি তাদের কেউ—

আ। লতিকা! আর সিন্ধু?

ভদ্র। যঁ্যা—

আ। ফটকের কাছে ঐ দাসীর কোলে খোকা আপনার?

ভদ্র। হাঁা, আপনি—

আ। এই খাতাখানা নিন।

আমি আর দাঁড়ালাম না, পত্রপাঠ সরে পড়লাম। এই বিরাট বিপুল ঘিফেড তেলালো শরীরখানি কি সিন্ধু হতভাগীর বিরহ-আগুণে দাতে দাতে ফুলে উঠেছে—

তোমারি বিরহে সই রে—
দিবানিশি কত সই,
রোচে নাকো মুখে আর
আলুর দম আর লুচি খই।

সিন্ধু ছেড়ে লতিকা? হায়রে মায়ার জগৎ! মানুষ কি এমনি ফক্কিকার? এতবড় জমাহীন বাধাহীন দ্বিধাহীন খরচে শেষটা একটা জমার অঙ্ক এসে গিয়ে রসভঙ্গ করে দিলে!!

